যোগভ্রষ্ট

যোগভ্রষ্ট

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

রঞ্জন প্রকাশালয়
২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১ম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৩৬ সাল
মূল্য দেড় টাকা

উৎসর্গপত্র

যাঁহার মধ্যে

কাব্যরস ও তত্ত্বজিজ্ঞাসা,

প্রাচ্যশাস্ত্র ও প্রতীচ্যবিজ্ঞান,

একই কালে অবিরোধে বিরাজ করিতেছে ;

অন্ধ হইয়াও পঠনপাঠনব্রতী,

যিনি বৃদ্ধ হইয়াও চিরনবীন,

সেই অদ্ভুত কর্ম্মা

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার মহোদয়ের

শ্রীচরণোদ্দেশে—

তাঁহারই স্নেহলালিত

'যোগভ্রষ্ট'

উৎসর্গ—করিলাম।

গ্রন্থকার।

এক

'General amnesty ! বোমার আসামীরা ফিরে আস্‌চে !'

খবরটা ফাটিয়া পড়িল, আকস্মিক গোলার মত। সকলেই বিচলিত হইলেন। কিন্তু বিনয় থামিতে চান না। কারণ তিনি ছিলেন তখনকার বক্তা। যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ানের মত অবিচ্ছেদে তিনি নিজের বক্তব্য শেষ করিলেন।

আলোচনাটা হইতেছিল দেশোদ্ধার লইয়া। বিনয় বলিতেছিলেন, ইংরাজের সঙ্গে টক্কর দিয়ে কিছু করা যাবে না। আমাদের উচিত তার স্বার্থে ব্যাঘাত না ক'রে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করা,—for instance, খুব বেশী ক'রে raw material produce করা।

অসম্ভব আগ্রহের সহিত রাজেন্দ্র এই বাক্যের সমর্থন করিলেন, আমিও তাই বলি—Produce your raw material—বোতল নিকালো। আজ rawই খেয়ে দেখ্‌বো।

যোগেশ বলিলেন, Let us drink—

এই অংশে সকলেই একমত। সকলেই নিজের নিজের গেলাস ভরিয়া লইলেন। বাক্যের শেষ দিকটায় কিন্তু মহা গণ্ডগোল বাধিল।

গেলাস খুব উঁচু করিয়া ধরিয়া যোগেশ বলিলেন, To the persecuted patriots !

নিজের গেলাস ঠিক সেই ভাবে ধরিয়া বঙ্কিম সংশোধন করিলেন, To the prostituted patriots !

তখন অনেকেই একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, নাঃ !—এ বড় অন্যায় কথা ! এ আমরা সহ্য কর্‌বো না।

বঙ্কিম। সহ্য কর্‌বে কি ক'রে ? তোমরা যে Freedom of Speech চাও।

যোগেশ। তুমি misdirected ব'লতে পার। তা নয়—

বঙ্কিম। ও একই কথা ! দেশোদ্ধারের কাছে every mistake is a crime, every misdirection is prostitution.

যোগেশ। দেশের জন্য যার প্রাণ কাঁদে, সে কাজ না ক'রে থাকৃতে পারে না। কাজ করতে গেলে একটু ভুল হতে পারে।

বঙ্কিম। প্রাণ কাঁদে ত ঘরে খিল দিয়ে গলায় দড়ি দিও। এক-ফোঁটা বিদ্যে নেই ! এককণা শক্তি নেই ! শুধু প্রাণ কাঁদে ! তাই ভাবাবেশে Steering ঘুরিয়ে জাহাজকে আঘাটায় কাৎ ক'রে দেবে, দধীচির বুক দিয়ে গড়া বজ্রকে বোমার ফুৎকারে নিঃশেষিত কর্‌বে !—দেশের best Spirits যারা এমন ক'রে নষ্ট করেছে, সেই নেতাগুলোকে চাঁদা ক'রে চুবিয়ে মারা উচিত।

রাজেন্দ্র। আর ক্ষেপিও না ! বঙ্কিমকে আর ক্ষেপিও না ! ভদ্রলোক নিজেই এখুনি গলায় দড়ি দেবে,—Lancashire Yarn পাকিয়ে !

হাসির সুরে যিনি তর্কের সমাধান করিলেন, তাঁহারই কিন্তু বেশী বিচলিত হওয়া উচিত ছিল। কারণ, এই আসামীদের মধ্যে একজন তাঁহারই কনিষ্ঠ—অজীন্দ্রলাল।

দুই

আণ্ডামানের ফেরত, রাজদ্রোহের আসামী, Terrorism-এর পাণ্ডা! না জানি লোকটা কত ভয়ঙ্কর! কিন্তু আজীন্দ্রকে দেখিয়া কে বলিবে এই বিশেষণগুলির একটিও তাহাতে প্রযুক্ত হইতে পারে? তাহার বালসুলভ মুখশ্রীর প্রতি রেখায় অপূর্ব্ব বিষাদ, তাহার চক্ষে অপরিসীম করুণা। দেখিলে মনে হয় না, এ লোক মশাটি পর্য্যন্ত মারিতে পারে। চিনিলেও মনে হয় না, মশা মারিবার মত নিষ্ঠুরতা তাহার মধ্যে আছে। অথচ এই লোকই বোমার আয়োজন করিয়াছিল,—অসংখ্য লোকক্ষয়ের কামনায়। আশ্চর্য্য! অতিকোমল জলকণার মধ্যে গিরিবিদারণশক্তি কোথায়, কেমন করিয়া লুকাইয়া থাকে, কে বলিবে?

তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যাইত, সে নিজেকে persecuted patriotও বলিত না, prostituted patriotও বলিত না। সে যাহা করিয়াছে, নিজের ইচ্ছাতেই করিয়াছে, কাহারও প্ররোচনায় করে নাই; এবং সে যাহা করিয়াছে, তাহার ন্যায্য দণ্ডই পাইয়াছে, অতিরিক্ত কিছু পায় নাই। তাই নিজের কৃতকর্ম্মের ফল সে হাসিমুখেই বহন করিয়াছে,—কাহাকেও দোষী করে নাই।—আর patriot, সে এক সময়ে হয়ত ছিল, এখন ত নয়ই।

তাই তৃপ্তি যখন জিজ্ঞাসা করিল, আবার দেশ দেশ ক'রে ক্ষেপ্‌বি না ত?

তখন আজীন্দ্র নিঃসঙ্কোচেই উত্তর দিল, আবার! না, বৌদি, ঢের শিক্ষা হয়েছে। ছোব্‌ড়া পিটিয়ে পিটিয়ে দেশভক্তি নিংড়ে বার ক'রে দিয়েছে একেবারে।

তৃপ্তি। কত কষ্টই পেয়েছিস !

আজীন্দ্র। কষ্ট পেয়েছি বৈ কি, বৌদি। কষ্ট দেবার জন্যই ত নিয়ে গেছ্‌লো। শক্ত muscle আছে, খাটতে হয়েছে, তাতে কষ্ট নেই। এই যে তোমাদের ছেড়ে থাকতে হবে, চিরকাল,—এইটাই একেবারে কাবু ক'রে ফেলেছিল। বেঁচে থাক্‌বো অথচ কোথাও কোন বন্ধন থাক্‌বে না,—এ কি জীবন্মৃত্যু, বাবা !—আচ্ছা, গুলি ক'রে মেরে ফেলে না কেন ?

তৃপ্তি। তা হ'লে ত আর তোকে ফিরে পেতুম না।

আজীন্দ্র। তা সত্যি ! তা হ'লে আর ফিরে আস্‌তে পারতুম না।—এ ত মুক্তি নয়, বৌদি, এ আমার নবজন্মলাভ।

তৃপ্তি। নবজন্মই ত।

আজীন্দ্র। অনেকে বলে, যদি নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ কর্‌তে পারতুম্, ত এই এই কাজ কর্‌তুম। তাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। আমার হ'য়েছে।—আর দেশের কথা নয়, বৌদি। এখন থেকে শুধু তোমাদের ঘরের একজন হয়ে জীবন কাটিয়ে দেব।

তৃপ্তি। হাঁ, কি হবে নিষ্ঠুর অদৃষ্টের সঙ্গে লড়াই ক'রে ? তাকে ত হটান যাবে না।

আজীন্দ্র। ঠিক ত ! সেই Reforms দিলে। আর দুদিন আগে দিলে হয়ত আমাদের এ দুর্ভোগ ভুগ্‌তে হ'ত না।

তৃপ্তি। যা হোক্‌, যার জন্য সাধনা করিছিলি, তার কিছু ত পেয়েছিস্‌। এখন শান্ত হ।

আজীন্দ্র। হ্যাঁ, এখন থেকে খুব শান্ত হয়ে থাক্‌বো।—আজকাল খবরের কাগজ পড়্‌চো, বৌদি ?

তৃপ্তি। আবার তুই খবরের কাগজ নিয়ে মাত্‌বি না কি ?

আজীন্দ্র। হাঁ, এই খবরের কাগজগুলো বড় মাথা খারাপ ক'রে দেয়। আমি এখন থেকে কাগজ পড়া বন্ধ ক'রে দেব। চোখ কান বুজে, দাঁতে দাঁত চেপে না থাক্‌লে বাঁচবো কি ক'রে?

তৃপ্তি। আমি একটি পাত্রী দেখি, তুই বে' কর্‌।

আজীন্দ্র। হাঁ, বৌদি একটা বিয়ে কর্‌তে হবে—আচ্ছা—

তৃপ্তি। আবার সেই কথা! আমার বড় ভয় হচ্চে, আজীন।

আজীন্দ্র। ভয় নেই, বৌদি। তুমি দেখে নিয়ো, আমি একেবারে লক্ষ্মীছেলেটি হয়ে গিছি।

তৃপ্তি! মাধুরীর খবর জানিস?

আজীন্দ্র। খবর নিই নি, বৌদি। আমার জীবন থেকে ত মাধুরী খ'সে গেছে।—আমাকে বড় ভালবাস্‌তো। একবার শেষ দেখা কর্‌বার জন্যে তার মনটা ছোটাছুটি ক'রে বেড়িয়েছিল। কিন্তু,—পর্দ্দানশীন মেয়ে,—দেহটাকে নিয়ে বাড়ীর বার হতে পারে নি।—আমি ফিরে আস্‌বো জান্‌লে হয়ত জান্‌লার গরাদে ধ'রে এই দশবৎসর ব'সে থাক্‌তো।—কখনো ভালবেসেছ বৌদি?

তৃপ্তি। না ভাই, ও আপদে কখনো পড়ি নি।

আজীন্দ্র। তা হ'লে কেমন ক'রে বুঝ্‌বে, বৌদি, যে বেত মেরে ভালবাসা ছাড়ান যায় না? ওগো! আমি যে দেখ্‌তে পাচ্ছি, আমার স্বদেশলক্ষ্মী ঐ বন্দিনী মাধুরীর মত উদাসনয়নে জানালার দিকে চেয়ে ব'সে আছেন, যুগযুগান্তকাল। তাঁর চক্‌চকে খোপা ও ঝক্‌ঝকে সাড়ী-সেমিজের পশ্চাতে একটি হৃৎপিণ্ড শরাহত পাখীর মত অন্তিম বেদনায় আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে মর্‌চে। আমিও পথ চেয়ে ব'সে আছি। আমারও সাম্‌নে কয়েদখানার গরাদে দেওয়া লোহার কপাট।—কিছু কর্‌তে পাল্লুম না! কিছু কর্‌তে পাল্লুম না!

তৃপ্তি ভীতিজড়িত স্বরে ডাকিল, আজীন।

আজীন্দ্র দ্বারের দিকে দেখাইয়া বলিল, পরদাটা টেনে দিয়ে যাও, বৌদি। আমি এখন আমার প্রিয়তমার সঙ্গে বাসর-শয়নে জাগবো।

তৃপ্তি দেখিল সে কাছে থাকিয়া আজীন্দ্রকে অনর্থক উত্তেজিত করিতেই থাকিবে। তাই তাহার কথামত পরদাটা টানিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

আজীন্দ্র গাহিতেছে, 'সার্থক জনম আমার তোমায় ভালবেসে।'

মুখের ভাষা আছে। চোখের ভাষা আছে। প্রাণের ভাষা যদি কিছু থাকে ত সে বুঝি এইরূপ।

তিন

আজীন্দ্রের কল্পলোকের স্বদেশলক্ষ্মী,—হায় রে! কোথায় তিনি? সে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, যে-দেশের জন্য সে দীর্ঘ কারাবাস বরণ করিয়াছিল, সে দেশ নাই, সে দেশপ্রীতি নাই, সেই দেশনেতাদের অনেকেই এখন নষ্ট মৃত প্রব্রজিত ক্লীব বা পতিতের দলে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রচণ্ড মশালটা আজ নিবু নিবু করিয়া জ্বলিতেছে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের সূতা ধরিয়া। তাহাতেও তৈল জোগাইতেছে বঙ্গে-বিদ্বেষ।

তাহার সহকর্ম্মীদের মধ্যে অনেকেই আজ অতিশান্ত গৃহস্থের মত কোম্পানীর আফিসে কর্ম্ম করিতেছে। 'ডালে ভাতে উদরটা পূর্ণ' করিতেই তাহাদের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হইয়া যায়। দেশের কথা ভাবিবার অবকাশও তাহাদের নাই—সাহসও নাই। অতীতকে তাহারা ভুলিতে

চায়, এবং অতীতের সাক্ষী আজীন্দ্রকে ভূতের মত ভয় করে। যাহাদের সহিত আণ্ডামানের অগ্নিপরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হইল, তাহারাও কেমন যেন পর হইয়া গেছে।

দাদা রাজেন্দ্রলালকে সে ভক্তি করিত। কর্ম্মক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়া সে তাঁহার কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাইয়াছে অনেকবার। তখন কে ভাবিয়াছিল, ইনিই একদিন নিষ্কামকর্ম্মীর একাগ্রতা লইয়া হুইস্কীর মধ্যে ডুবিবেন, এবং কেহ প্রশ্ন করিলে বলিবেন, দেশে জল নেই। হুইস্কী খাও।

আজীন্দ্র সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়। জবাব দিত, জল নেই, জল আমদানী করুন।

রাজেন্দ্র। করা যাবে না। গ্রামে পুকুর কাটিয়ে দিয়ে এলুম। লোকে তাতে কলেরা গুলে রাখ্‌লো। ট্যাঙ্কে জল ভ'রে ট্যাপ লাগিয়ে দিলুম। ট্যাপগুলো খুলে নিয়ে গেল।

আজীন্দ্র। ওটা ছেলেদের কাজ, নিশ্চয়।

রাজেন্দ্র। ঠিক বলেছ! ওটা ছেলেদের কাজ। বাপেরা কিন্তু দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে জল নষ্ট হচ্চে,—কেয়ার করলে না। আধ্যাত্মিক জাত! বল কি! ঐ একটু আধটু ক্ষতি কি এদের গায়ে লাগে? দেশের অর্দ্ধেক মানুষকে এরা ভোগ্যবস্তু ক'রে রেখেছে, তাদের হাতে পায়ে কাজ দেয় নি; এক কোটি লোকের অন্ন রোজ ফেলজোলঙ্গার মধ্যে ঢেলে দিচ্ছে—কুছ পরোয়া নেই! এমন অপূর্ব্ব জাত, তোমার দুফোঁটা জল সাম্‌লে বেড়াবে! একি একটা কথা হ'ল!—আমি হুকুম দিলুম, সব তোড়্‌ ডালো।

আজীন্দ্র। তাতেই বা জলকষ্ট দূর হবে কি ক'রে?

রাজেন্দ্র। জল কষ্ট দূর হবে না।—হুইস্কী খাও।

আজীন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। রাজেন্দ্রের হুইস্কী প্রীতিকে সে নিজের অন্তরে অনূদিত দেখিল,—হায়, হায়! হায়, হায়!

রাজেন্দ্রের এই পরিবর্ত্তনের তবু একটা কারণ পাওয়া গেল। কিন্তু বঙ্কিম? সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন যে হইয়াছে তাঁহারই। তাঁহার এরূপ হইবার কি কারণ আছে?

এক সময়ে ইনি আজীন্দ্রদের দলে ছিলেন। আইন অমান্য করিতে, বিঘ্নবিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে, এবং সাহেবের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া বিবাদ করিতে, ইঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। ইনি নিজে বোমা ছোঁড়েন নাই। বোমার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও অজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু বক্তৃতার সময়, বোমার হিতকারিতা প্রচার করিতে একেবারে শতমুখ হইয়া উঠিতেন! সেই বঙ্কিম আজ বিজ্ঞ হইয়াছেন, গম্ভীর হইয়াছেন, তাহাদের দল ছাড়িয়া দাদাদের দলে মিশিয়াছেন। এখন তাঁহার সহিত 'আপনি' বলিয়া কথা কহিতে হয়। এখন কথায় কথায় তাঁহার গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যায়, 'দেশভক্তি is a barbarous instinct.'

বঙ্কিমের মুখে এই উক্তি প্রথম যেদিন শুনিল, সেদিন আজীন্দ্র বিশ্বাস করিতে পারে নাই, যে কথাটা ঠিক শুনিয়াছে। সভয়ে প্রশ্ন করিল, কি বল্লেন?

বঙ্কিম। আমি বল্‌ছি, এই তোমরা যাকে দেশভক্তি বল, clannishness, বা বড় কথায়, nationalism,—অতি নোংরা জিনিস ওটা।

আজীন্দ্র। এই অধঃপতিত দেশের জন্য আমার প্রাণ কাঁদে, অতি নোংরা জিনিস এটা!

বঙ্কিম। হাঁ। সকল অধঃপতিতের জন্য প্রাণ কাঁদা উচিত।

কোন একটি দেশের জন্য কেন? 'পিপাসিত দাসগুপ্তকে জল দেব', বল্‌লে কেমন শোনায়?

আজীন্দ্র। আপনি ছোট ক'রে, বিকৃত ক'রে দেখচেন।

বঙ্কিম। ছোটই ত। এই যে national dress ব'লে চীৎকার কর—মেয়েদের national dress বল্‌তে কি বোঝ? ঘাগ্‌রা? পায়জামা? কাছা দেওয়া সাড়ী? কোনটাই না। পূর্ব্ববঙ্গের দোফেট্টা সাড়ীকেও national বল্‌বে না হয়ত!

আজীন্দ্র। তা হ'লে কি করতে বলেন? ইংরাজ তার clannishness বজায় রাখুক পুরা মাত্রায়? সে জলসংগ্রহ করুক তিনজন দাসগুপ্তের জন্য? আর আমরা বিশ্বপ্রেম নিয়ে তার দোর গোড়ায় প'ড়ে 'হা জল! হা জল!' ক'রে বুক ফাটাই!

বঙ্কিম। কেন, সে ত তোমাকে একেবারে বঞ্চিত করচে না।

আজীন্দ্র! একেবারে বঞ্চিত করলে ম'রে যাব যে! আমি ম'লে ঐ দাসগুপ্তদের জন্য জল পাম্প করবে কে?

বঙ্কিম। তা ছাড়া করবে কি তোমরা? দুটি তিনটি লোক নিয়ে তোমাদের এক একটা Clan। এই অসংখ্য conflicting clansকে এক করবার চেষ্টা করবে ইংরেজ। যদি কখনও এক হতে পার, তখন তার বিরুদ্ধে দাঁড়িও। অস্ত্র সে নিজেই তোমার হাতে দিয়ে দিচ্চে।

আজীন্দ্র। অস্ত্রের দরকার হবে না। আপনারা যখন রয়েছেন তখন আর ব্রিটিশ রাজত্বের মার নেই। Three cheers for our eternal trustees, the British Profiteers!

বঙ্কিম। Three cheers for the noble race of David Hares and Henry Cottons!

ইহার পর হইতে বঙ্কিমকে সে শত্রুর মত দেখিত। তিনি যাহা বলেন তাহা যে নিজের মন হইতে বলিতে পারেন, একথা সে মানিতেই চাহে না। আজীন্দ্রের বিশ্বাস বঙ্কিম আত্মরক্ষার্থ দেশবিদ্রোহীর মুখোস পরিয়াছেন।

জ্ঞানের রাজ্যে ভিন্ন মত, বড় জোর মূর্খতার নিদর্শন। তাহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে। কিন্তু মানার রাজ্যে ভিন্নমতাবলম্বী মাত্রেই ভণ্ড, কাপুরুষ, ও দেশবৈরী। তাহাকে উপেক্ষা করা চলে না। তাহার প্রতি একমাত্র সুবিচার,—হিংস্র 'Inquisition.'

চার

'পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং।' দীর্ঘ দশবৎসরে পরিবর্ত্তন হইয়াছে অনেক কিছু,—অনেক দিকে। কেবল দুইটি লোক মোটেই বদলায় নাই। একটি তাহার বৌদিদি তৃপ্তি, আর একটি তাহার পূর্ব্বসহপাঠী মহিম।

পরিবর্ত্তন ঘটাইবার হেতু তৃপ্তির মধ্যে ছিল। তিনি সুশিক্ষিতা। গভার্নেসের হাতে মানুষ হইয়াছিলেন—খুব high heeled জুতার উপরেই! কিন্তু প্রতিকূলে ছিল নারীত্ব। অধিকাংশস্থলেই নারীর সকল শিক্ষার পরিসমাপ্তি হয় আঁতুড়ঘর বা পাকশালায়। তৃপ্তিরও তাহাই হইয়াছিল। তাঁহার আঁতুড়ঘর ছিল না। পতিদেবরের সুখ-সুবিধার চিন্তাতেই নারী-জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন! ইহাদের সুখনিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটাইয়া যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারে হউক, যদি না পারে অধঃপাতে যাক্,—এইরূপই তাঁহার

মনোভাব। এই মনোভাব ছিল দশবৎসর পূর্ব্বে। এখনও তাহাই আছে।

মহিমের পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাহার কারণ সে বর্ত্তমানের লোক। অতীতের দিকে হাত বাড়াইয়া হাহাকার করে না, ভবিষ্যৎকেও টানিয়া হাজির করিতে চাহে না। সে মুখে বলে, এবং মনে মনে বিশ্বাস করে যে, Whatever is, is the inevitable result of whatever was —যাহা আছে তাহার চেয়ে ভাল আর কিছু হইতে পারে না। বর্ত্তমানের সব কিছুই যে তাহার চক্ষে ভাল লাগিত, তাহা নহে। কিন্তু এরূপ স্থলে সে নিজের বুদ্ধিকেই দোষী করিত। সে মনে করিত আর একটু বেশী বুদ্ধি থাকিলে সে এই মন্দের ভিতর হইতে অন্তর্নিহিত শুভকে নিশ্চয়ই আবিষ্কার করিতে পারিত। আইন মাত্রকেই সে মানিয়া চলিতে চায়, সে আইন শাস্ত্র-কর্ত্তাদের হউক, কি শাসনকর্ত্তাদের হউক। সব আইন অবশ্য মানিতে পারিত না। কিন্তু এই না মানাকে নিজের ত্রুটি বলিয়াই স্বীকার করিত।

—"কিন্তু সব আইন কি ভাল?"

—"আমরা বিচার কর্‌লে ভুল কর্‌বো। ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা আছে একমাত্র ভবিষ্যৎ কালের।"

Uncle Tom's Cabin হইতে উদ্ধৃত করিয়া আজীন্দ্র গর্জ্জন করিত, Whose Law? I had no voice in the making of that law.

মহিম উত্তর দিত, But we have not found our voice yet.

আজীন্দ্র। তাই সব আইন মান্‌তে হবে?

মহিম। হবে বৈ কি! আমাদের ভালর জন্যই ত সেগুলো তৈরী হয়েছে।

আজীন্দ্র। কিন্তু আইনকর্ত্তা যে বিদেশী, সেটা জানা আছে?

মহিম। হ'লেই বা বিদেশী। তুমি কি বিদেশী চাকরের ওপর বেশী অত্যাচার কর?

আজীন্দ্র। কিন্তু আমাদের সঙ্গে যে তার স্বার্থের সংঘর্ষ রয়েছে।

মহিম। এইটে বাজে কথা। ইংরাজের স্বার্থে ব্যাঘাত কর্‌বে তোমরা! দুটো বয়কটের বক্তৃতা ক'রে? তা হয় না। তোমরা তার কিছুই কর্‌তে পার না। তোমরা শুধু বিরক্ত কর। হাতীর পাশে মশার প্যান্‌প্যানানি। সে একবার কানঝাড়া দেয়, আর তোমরা কোথায় ঠিক্‌রে গিয়ে পড় ঠিক থাকে না। তোমাদের মেরে ফেলাই তার উদ্দেশ্য নয়।

ইহার পর আর তর্ক করিতে আজীন্দ্রের প্রবৃত্তি থাকে না। আজীন্দ্রের দুর্ভাগ্য যে এই তৃপ্তি ও মহিম ছাড়া অন্য লোক ছিল না যাহার কাছে সে মন খুলিয়া কথা কহিতে পারে। অথচ ইঁহাদের সহিত তাহার মনের সুর মিলিত কই? আজীন্দ্রের প্রতি উভয়েই সমান স্নেহশীল। অকপট স্নেহের প্রাচুর্য্য যদি মানুষকে সুখ দিতে পারিত ত আজীন্দ্রের মত সুখী আজ কে? কিন্তু চলচ্চিত্ত পুরুষের কাছে স্নেহ একটা বন্ধনই নয়। স্নেহ দিয়া বশ করা যায় জড়ধর্ম্মী মানুষকে। যাহার প্রাণ আছে, যাহার মন সৃষ্টি করে, সংগ্রহ করে, আপনাকে বিবর্ত্তিত করে,—তাহাকে বশ করিতে পারে—একমাত্র সমঝ্‌দার। আজীন্দ্রের সে সমঝ্‌দার কোথায়? 'আজ কাঁটাল বিচি খেতে ইচ্ছা হচ্চে,' 'জুতোজোড়া পায়ে কষা হয়েছে,' শুধু এই কথা বলিবার জন্যই কি মানুষ সঙ্গ চায়?

আজ তাহার মত নিঃসঙ্গ কে? তাহার হাতে কোনও কাজ নাই। আণ্ডামানের ছাপ বহিয়া সে কোন কাজে প্রবেশ করিতে পারে না।

স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করিবার মত শিক্ষাও সে পায় নাই। তাহার জীবনের যে মিশন ছিল, যে কথা সে বলিতে আসিয়াছিল—যে কথা কড়া চুরুটের ধোঁয়ার মত তাহার গলার কাছে তাল পাকাইয়া উঠিতেছে, সেটাকে উদ্গার করিবার মত স্থান কাল পাত্র, সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। 'উৎপৎস্যতেঽস্তি'র আশায় কিছু লিখিতেও পারে না। কারণ সব কথা মুখ ফুটিয়া বলিবার অধিকার তাহার নাই। সব দিক দিয়া যে বিষয়ের আলোচনা করিতে না পারিবে, সে বিষয়ের অবতারণাই বা করিবে কোন্ মুখে ?

তবে সে করিবে কি ? ঘরে বসিয়া আপন মনে সেতার বাজাইবে ? না কবিতা লিখিবে ? ঝুমঝুমির আওয়াজে মজিবার মত শৈশব কি তাহার আছে ! কবিতা লেখার বাতিক একসময়ে তাহার ছিল, এখন নাই। যাহার কিছু বলিবার আছে, সে কি চক্রবন্ধ মণিবন্ধের আড়ালে আসল কথাটাকে চাপিয়া রাখে, না ছন্দ মিলের কঙ্কনঝঙ্কারে তাহা হইতে লোকের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে চায় ? লাইনগুলাকে লইয়া বিচিত্র প্যাটার্ণে সাজাইতেই যাহার সময় কাটিল, সে আবার বলিবে কি ? কিছু বক্তব্য নাই, শুধু 'কথার সাথে কথা, গাঁথ কথার মালা, মিলের সাথে মিল, মিলাও মিল,'—এটা ত বর্ব্বরের কাজ।

হায়, হায় ! কারামুক্ত জীবনের বিরাট শূন্যতা সে ভরাট করিবে কি দিয়া ? তাহার মনে হইল সে যেন pirate ship হইতে উদ্ধার পাইয়া জনশূন্য দ্বীপের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছে। এখানে সবই আছে,—মুক্ত আলোকের আশীর্ব্বাদ, মৃদু সমীরণের স্নেহস্পর্শ, নির্ঝরিণীর কলতান, তরুলতা পুষ্পবল্লবের সেবাকুশলকরোৎক্ষিপ্ত পর্য্যাপ্ত পূজোপচার,—দেহকে পরিতৃপ্ত করিবার আয়োজন সবই আছে। নাই কেবল মনের খোরাক, নাই কেবল হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইবার

লোক, নাই কেবল আত্মাকে বিকশিত করিবার অবকাশ। এই কি মুক্তি? ইহার চেয়ে বন্ধন যে ছিল ভাল। আজীন্দ্রের প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। এমন সময়ে—a sail! a sail, দূরদিগন্তের ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণ হাস্যরেখার মত একখণ্ড পাল!—একখানা সাড়ীর আঁচল!

পাঁচ

—'মাইজী আপনাকে ডাক্‌ছেন।'

—'আমাকে?'

—'জী।'

এ কোন্ মাইজী তাহাকে ডাকিল? এ রাস্তায় কাহাকেও ত সে চিনে না। তাহাকে ডাকিবার মত মাইজী এখানে কোথা হইতে আসিল? যাহা হউক একটা adventure ত হইবে। ভৃত্যের অনুসরণ করিয়া আজীন্দ্র যে বাড়ীতে প্রবেশ করিল সেখানকার একটি দ্রব্যও তাহার পরিচিত নহে। সে বড় সঙ্কোচ অনুভব করিল। বার বার প্রশ্ন করিল, 'ভুল করনি ত? আমাকেই ডেকেছিলেন, ঠিক?'

—"হাঁ, আপনাকেই ডেকেছেন।"

একটি সুসজ্জিত কক্ষে সুরম্য আরাম-কেদারায় বসিয়া আজীন্দ্র আজ আরব্যোপন্যাসের কোন এক অশ্রুতপূর্ব্ব পরিচ্ছদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার চমক ভাঙিল পদপ্রান্তে প্রণত স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়া। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল, সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল 'আপনি?'—

রমণীও উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার সমস্ত মুখ তখন হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে।

আজীন্দ্র চাহিয়া দেখিল এ যে তাহারই মাধুরী!

গলার কাছে কি একটা ঠেলিয়া উঠিতে সে চোখ ফিরাইল। তার পর নিজেকে সংবরণ করিয়া আবার চাহিল। দেখিল মাধুরীর সদ্যঃস্নানসিক্ত-সিঁথায় একটি সিঁদুরের রেখা বলির খড়্গের উপরে কবোষ্ণ রক্তলেপের মত জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। এ মুখের দিকে আর সে তাকাইতে পারিল না। গল্ গল্ করিয়া কতকগুলা কথা কহিতে পারিলে সে বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু কথা জোগাইল না। তাই মাধুরী যখন বলিল, 'আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন।' তখন একটা কিছু করিবার সুযোগ পাইয়া সে দ্বিরুক্তি না করিয়া বসিয়া পড়িল। একবার বলিল, 'তুমি আমায় ডাক্‌লে!'

মাধুরী। আপনি এসেছেন শুনে পর্য্যন্ত মনটা বড় চঞ্চল ছিল। আজ তাই রাস্তায় দেখে আর থাক্‌তে পারলুম না।

আজীন্দ্র। তুমি আমায় ডাক্‌লে ত?

কথার অভাবে এই কথাটাই সে বার বার আবৃত্তি করিতে লাগিল।

মাধুরী বলিল, 'কেন কিছু অন্যায় করিছি,—ডেকে?'

আজীন্দ্র। না, অন্যায় নয়,—তবে আমাকে ত কেউ ডাকে না। সবাই ভয়ে পালায়।—বেশ ঘর সাজিয়েছ, মাধুরী। এর সর্ব্বত্র আমি তোমার হাত দেখতে পাচ্চি।

মাধুরী। চা নিয়ে আসি?

আজীন্দ্র। চা খাব?—আন।

চায়ে চুমুক দিয়াই বলিল, 'এমন চা অনেকদিন খাইনি, মাধুরী। তুমি পাকা কারিগর হ'য়ে উঠেছ।'

মাধুরী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'চা আমি করিনি। আমার ননদ করেছেন।'

আজীন্দ্র হাসিতে যোগ দিল না। হয় ত সেদিকে তাহার কান ছিল না। সে অনেকটা নিজের মনেই বলিল, 'আশ্চর্য্য—না? তোমার বাড়ীতে চা খেয়ে গেলুম?'

মাধুরী কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল। বলিল, 'চল্লুম।'

মাধুরী। এখুনি যাবেন? একটু বস্‌বেন না?

আজীন্দ্র। না, যাই।

মাধুরী। আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন। তিনি প্রায়ই আপনার কথা বলেন।

'আচ্ছা দেখা ক'রবো।' বলিয়া সে তড়তড় করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

ছয়

'আমার স্বামী প্রায়ই আপনার কথা বলেন।' কি মুস্কিল! শেষে কি দেখিতে হইবে, মাধুরীর হৃদয়-দুয়ার আগুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে অবধ্য শত্রু, মিত্রতা? কিন্তু, না। যে ব্যক্তি বাহিরের ঘরে তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন, তিনি পূর্ব্ব-পরিচিত হইলেও আজীন্দ্রের বন্ধুবর্গের কেহ নহেন। বাগ্‌দত্তা মাধুরীর সহিত যখন সে দেখা-শুনা করিতে যাইত তখন ইঁহার সহিত দু'একবার আলাপ হইয়াছিল। তখন ইনি ছিলেন সে বাড়ীর সুহৃদ্, এখন হইয়াছেন জামাতা।

ভদ্রলোকের নাম ব্রজদুলাল। চেহারা দেখিলেও একটা দুলালী ভাব মনে আসে। নধর শরীর, পরিপাটি বেশ-বাস, 'কস্‌মেটিক' লাগান নিরেট গোঁফের নীচে একটা চাপা হাসি অবরুদ্ধ দুষ্ট ছেলের মত কেবলই বাহিরে আসিবার ফিকির খুঁজিতেছে। গোঁফের দুই প্রান্ত এক সময়ে খুব স্থচাল করিয়া উপরের দিকে চড়ান থাকিত। সম্প্রতি 'কাইসার' বিদ্বেষে এদুটি আত্মহত্যা করিয়াছে। মাথার বিরল কেশে প্রসাধনের বিপুল আয়োজন,—জরা ও 'হেয়ার অয়েল'এ মিলিয়া গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ !

আজীন্দ্রকে দেখিয়াই ইনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন, 'আ রে ! এসো এসো। একবার দেখা করতে যাব ভাবি, কাজের হিড়িকে পেরে উঠি না। আছ কেমন ?—এ,—মাধুরী !'

ডাকটা ভিতরের দিকে পাঠাইয়া দিলেন। মাধুরী জীবিত থাকিলে সে ডাক শুনিতে পাইবেই। কে বলে বেতার খবর পাঠাইতে যন্ত্রের প্রয়োজন হয় ? তার পর আজীন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আমার একটা গুরুতর সম্বন্ধ আছে। স্ত্রীর ভাইকে শালা ব'লে ডাকৃতে হয়। স্ত্রীর fianceকে কি বল্‌তে হয় ঠিক জানি না।'

আজীন্দ্রও হাসিয়া জবাব দিল, 'কিছু বল্‌তে হয় না। একদম্ duelএ আহ্বান করতে হয়।'

ব্রজ। সেটা কিন্তু fianceএর কাজ।—প্রকাণ্ড experience নিয়ে এসেছ হে। তোমার সঙ্গে একদিন আলাপ করতে হবে।

এই সময়ে মাধুরীকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই ব্রজদুলাল চীৎকার করিলেন, 'কে এসেছে দেখ।'

মাধুরী। দেখেছি। আমিই ত ডেকে পাঠিয়েছিলুম।

ব্রজদুলাল কপালে করাঘাত করিলেন। বলিলেন, 'ও, এর

মধ্যে দেখাশুনা হয়ে গেছে! আমি ভয়ে ভয়ে গলির ভেতর বাসা নিলুম—সেখানেও নিস্তার নেই! আমার অসাক্ষাতে এই সব কাণ্ড হচ্চে!

মাধুরী। কি যে বল তুমি! ছিঃ!

ব্রজ। ছিঃ কি? এই লোক ঘরে ঢুকলে আমি কি আর পাত্তা পাব? এই রূপ, এই পৌরুষ! আমাকে শেষ কালে ভেতর-বাড়ী থেকে বার-বাড়ী, বার-বাড়ী থেকে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে দেখচি।

'তবে তুমি পাগ্‌লামী কর। আমার ভাল লাগে না'—বলিয়া মাধুরী প্রস্থান করিল।

ব্রজদুলাল খুব একচোট হাসিয়া লইলেন। আজীন্দ্র বলিল, 'আপনি দালাল না?'

ব্রজ। হাঁ ভাই, দালাল! কেন বল দিকি?

আজীন্দ্র। তাই দেখ্‌চি। একটা কথা যদি ধরেন, ত লোককে একেবারে দিক্ ক'রে তবে ছাড়েন।

ব্রজ। মাধুরীর রাগের কথা বল্‌চো?

আজীন্দ্র। হাঁ, তাঁকে ডেকে আন্‌লেন, অথচ দাঁড়াতে দিলেন না।

ব্রজ। দাদা, দালালী ত করনি। জিনিষ চিন্‌বে কি ক'রে? ও রাগ মানেই অনুরাগ। মেয়েমানুষের মন—negative plate. ওখানে যেটা কাল দেখায় সেইটাই আসলে সাদা।

আজীন্দ্র। আপাততঃ আপনার দিকেই প্লেটখানা বড় বেশী কাল দেখাচ্চে।

ব্রজ। বেশী কাল দেখাচ্চে, না? বলিয়া তিনি আবার হাসিতে লাগিলেন।

সাত

সারা ভারতের শাসনতন্ত্র যে ভাঙিয়া গড়িতে চায়, পরাক্রান্ত ব্রিটিশ আধিপত্যকে যে উড়াইয়া দিবার স্পর্দ্ধা রাখে, তাহাকে এতটা অবশ করিল কিসে? মাধুরীর সম্মুখে সে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারে না, একটা কথাও গুছাইয়া বলিতে পারে না। তাহার হইল কি?

এদিকে মাধুরী কেমন সপ্রতিভ! কেমন হাসিমুখে তাহাকে গ্রহণ করে। কেমন সহজভাবে কথা কয়!—আহা! মাধুরী তাহার কি না হইতে পারিত? ঐ মুখ, ঐ হাসি, সিঁথির গোড়ায় ঐ জ্বলন্ত সিঁদুরের রেখা, সবই ত তাহার হইতে পারিত। অথচ আজ মাধুরীর মত পর কে? এতদিন যাহার ধ্যান করিল, নিরলস দিবা, বিনিদ্র বিভাবরী, মনের অন্তস্তলে যাহাকে লালন করিল, বহন করিল, সে এতই পর? বায়সের মত মুখের গ্রাস দিয়া বাঁচাইয়াছে সে পরের শাবককে?

অদৃষ্টের এ কি বিড়ম্বনা! মাধুরীর সহিত আবার মিলন ঘটাইবার কি প্রয়োজন ছিল? অতীতের সুপ্ত দৈত্যটাকে ঝাঁকানি দিয়া জাগাইয়া দিল, অথচ তাহার খোরাক দিল না।

কিন্তু মাধুরীর ত কোন বিকার নাই। আশ্চর্য্য! তাহার মনের ঝড় মাধুরীর হৃদয়-সরোবরে একটি তরঙ্গও তুলিল না। কিন্তু এইটাই বোধ হয় স্বাভাবিক। পতিগতপ্রাণা সতীর মনই বোধ হয় এইরূপ। কিন্তু তাই কি সত্য! এমনি করিয়া কি সতী হওয়া যায়! এমনি করিয়া কি ভুলিতে পারা যায়? উন্মুখ হৃদয়কে শুধু মুখের কথায় ফিরাইয়া দেওয়া যায়! অসম্ভব! সতী হইলেও সে মানুষ ত। না, না, না! মাধুরী ছলনা করিয়াছে। সে নারী। প্রতারণায় সে কৃতী, আত্মগোপনে সে ওস্তাদ। এই দুইটা অস্ত্র লইয়াই সে দুর্দ্দান্ত পুরুষকে,

বশ করিয়া আসিয়াছে অনাদি কাল। ছলনা নহিলে এত হাসি কিসের? এত হাসিই কি সহজ? না, না, এ ত হাসি নয়। এ যে অশ্রুর শতদল, এ যে বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তোচ্ছ্বাস, শিমুল ফুলের মত ফুটিয়াছে, রস শুকাইয়া, পাতা খসাইয়া, সর্ব্বাঙ্গ রিক্ত করিয়া।

ছলনাই যদি হয়, তাহার প্রতি মাধুরীর অনুরাগ আজও অক্ষুণ্ণ আছে, ইহাই যদি সত্য হয়, তাহাতে অজীন্দ্রের লাভ কি? মাধুরীর মনের গোপন স্তরে যাহা আছে তাহা গোপনেই থাকুক না। কাজ কি সে তত্ত্বান্বেষণে? সে সহজভাবে ব্যবহার করিতেছে। সে ব্যবহার সহজ ভাবে গ্রহণ করিলেই ত হয়। মাধুরী পারিল, আর সে পারিবে না?

নারীর সহিত পুরুষের কি একাধিক বন্ধন থাকিতে পারে না? মাধুরীর সহিত তাহার একটি মধুর সম্বন্ধ ছিল সত্য। তাই বলিয়া কি নূতন সম্পর্ক পাতান যায় না? মাধুরী পারিল, আর সে পারিবে না!

ব্রজদুলালের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে চাহে কেন? এত ভয় কিসের? নূতন আবেষ্টনের মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়ান কি এতই শক্ত? মাধুরী পারিল, আর সে পারিবে না। দুজনেই ত মানুষ!

দুজনেই মানুষ হইলেও একজাতীয় মানুষ নয়। তাই মাধুরী যাহা পারিল, সে তাহা পারিল না। সহজ ভাবে চলিবার অতিচেষ্টা তাহার চলনকে অশোভন রকমে পঙ্গু করিয়া দিল মাত্র।

সে কথা কহিতে গিয়া দেখিল, যে কথাটা বলিতে চায়, শুধু সেইটাই বলিতে নাই। এই সকল অকথিত উক্তি তাহার মনের কন্দরে ঝরণার জলের মত সঞ্চিত হইতে লাগিল। তার পর, যে দিন বাঁধ ভাঙিল, সে দিন কি মহাপ্লাবন! আবেগের মশালটাকে অধোমুখে

ধরিতেই সেটা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া যে অগ্নিকাণ্ড করিল, তাহার কি ভস্মধূসর পরিণাম !

অন্য দিনের মত সে দিনও সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ কি মনে হওয়াতে ফিরিয়া গেল, এবং মাধুরীকে দেখিতে পাইয়াই বলিয়া উঠিল, 'একটা কথা মনে হ'ল, মাধুরী ! জুলুমেরই কি জয়জয়কার হবে চিরকাল ? ইংরেজ বলেছে আমার বাঁচবার অধিকার নেই,—তাকেই আইন ব'লে মেনে নেবো ? সমাজ বলেছে, আমার সুখী হ'বার অধিকার নেই, তাকেই নীতি ব'লে মেনে নোবো ? তোমার হাত থেকে শুধু এক কাপ চা খেয়েই ফিরে যাব, এত পর আমি ?

মাধুরী। অমন ক'রে বল্‌বেন না। আমি বিবাহিত,—আমার স্বামী—

আজীন্দ্র। কে তোমার স্বামী ? একজন টিকিওয়ালা দুটো মন্তর প'ড়ে তোমার দেহটাকে একজনের সঙ্গে জুড়ে দিল, অমনি সেই তোমার স্বামী হয়ে গেল ? সেই তোমার আপনার ? আর আমি কেউ নই ? হৃদয়ের বন্ধন কিছু নয় ?

মাধুরী। আপনি আমার ভাই।

আজীন্দ্র। ভুল ! ভুল ! মাধুরী, ঢোঁড়া ব'লে আজ্ঞা কর্‌লে গোখুরার বিষ কমে না। ভাই আমি নই। ভাই হতে পার্‌বোও না কখনো।

মাধুরী। আপনি জানেন না আমার কতটা ক্ষতি কর্‌চেন। যদি জানেন ত এমন ক'রে কথা কইতেন না।

আজীন্দ্র। ক্ষতি কর্‌চি ?

মাধুরী। করচেন ত। আমাকে ধর্ম্ম থেকে বিচলিত করবার চেষ্টা কর্‌চেন।

আজীন্দ্র। কিন্তু প্রেমই ত বড় ধর্ম্ম, মাধুরী। প্রেমই সকলের চেয়ে বড়।

মাধুরী। না। কর্ত্তব্য তার চেয়েও বড়।

আজীন্দ্র। মিথ্যা কথা! তা যদি হ'ত তা হ'লে এই হাজার হাজার বছর ধ'রে দেশের আবালবৃদ্ধ ঐ কুলত্যাগিনী রাধিকার পূজা করতো না।

মাধুরী কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না।

আজীন্দ্র বলিতে লাগিল—'সেদিন আমাকে ডাকলে কেন? বেশ ছিলুম, ডাকলে কেন? ডাকাতকে তার হারানো রত্নের সন্ধান দিয়েছ। এখন ত সে রিক্তহস্তে ফিরবে না মাধুরী'—বলিতে বলিতে আজীন্দ্র দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হস্ত ধরিল।

মাধুরী সচকিতে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'হাত ছোড়, এখুনি কে দেখ্‌তে পাবে!

হাত ছাড়িয়া দিতেই সে ছুটিয়া পালাইল।

একদানেই লক্ষ্যভেদ! তাগকরা গুলিটা ঠিক জায়গাতেই লাগিয়াছে। শাখাচ্যুত পাখীটা এইবার ঝট্‌ পট্‌ করিয়া মাটিতে পড়িল বলিয়া,—ঘাড়মুড় গুঁজ্‌ড়াইয়া।

শিকারী লাফাইয়া উঠিল। একবার বলিবার চেষ্টা করিল, 'বা! বাঃ!' কিন্তু তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, 'ছি, ছি, ছি, ছি, ছি!'

আট

'রে হস্ত দক্ষিণ!' আজীন্দ্রের মনে হইল তাহার হাত যেন বোমা ছুঁড়িবার জন্যই প্রস্তুত হইয়াছিল। মাধুরীকে তাহার 'ধর্ম্ম হইতে বিচলিত' করিল সে কিসের লোভে? তাহাকে সে পাইবে কেমন করিয়া? সে বিবাহিত। ব্রজদুলালের বর্ত্তমানে তাহাকে বিবাহ করা যায় না। জাহাঙ্গীরের মত শেরকে মারিয়া মেহেরকে দখল করাও সম্ভব নয়। বিবাহ না করিয়া যে সম্বন্ধটা দাঁড়াইবে, তাহার মধ্যেই বা সে আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে কিরূপে? কিছু নয়। এ শুধু খেলার ছলে—শুধু একটা কিছু করিবার বেগে, সে এই কাণ্ড বাঁধাইয়া বসিয়াছে। মাধুরী হয়ত স্থিতিলাভ করিয়াছিল, হয়ত শান্তি পাইয়াছিল,—সে স্থিতি নষ্ট করিল, সে শান্তি দুই হাতে ভাঙিয়া দিল, শুধু ভাঙিবার নেশায়।

দিক্-বিদিকে কোথাও উধাও হইয়া ছুটিবার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু ছুটিবে কোথায়? মাধুরীকে বেষ্টন করিয়া যে সূত্র তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহার বন্ধন যে দুশ্ছেদ্য। কেন্দ্রাতিগ গতির বেগ যত বাড়িতে লাগিল, কেন্দ্রের দিকে টানও তত প্রবল হইয়া দেখা দিল, ততই জোরে সে তাহার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল, এবং ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর বৃত্ত রচনা করিতে করিতে একসময়ে তাহারই উপরে সমাহিত হইল। অচিন্ত্যপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেও তাহার বিলম্ব হইল না।

মহিম বলিল, '১২ নম্বরে বড্ড বেশী যাতায়াত কর্‌চো।'

আজীন্দ্র। হাঁ করচি। এটাকে তুমি দোষের বল্‌চো?

মহিম। লোকে যা তা বল্‌তে আরম্ভ করেছে।

আজীন্দ্র। লোকনিন্দা দিয়ে কাজের ভালমন্দ বিচার কোরো না। পাঁউরুটি খেলে এক সময়ে লোকনিন্দার অবধি থাক্‌তো না। পাঁউরুটি খাওয়াকে অবশ্য পাপ বল না।

মহিম। সমাজ রাখ্‌তে গেলে লোকাচার মান্‌তে হয় বৈ কি।

আজীন্দ্র। লোকাচার মান্‌তে গেলে বালবিধবাকে নির্জ্জলা একাদশী করাতে হয়। আমি সেটা পার্‌বো না।

মহিম। আচ্ছা, মাধুরী কি বলে?

আজীন্দ্র। কি আবার বলবে? বার বার পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু পেরে ওঠে না। দিবাবসানে ছায়ার মত বহুদূর থেকে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়্‌তে থাকে।

মহিম। দেখ, যে কোন love-makingএর প্রত্যেক খুঁটিনাটি শুন্‌তে ভারি কৌতূহল হয়। কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে কি, বেশীক্ষণ ভাল লাগে না। আদিরসের সঙ্গে খানিকটা করুণ আর বীভৎস মিশে সবটাকে বিস্বাদ ক'রে তোলে। উপভোগ কর্‌বো কি? আমার কেবলই মনে পড়্‌তে থাকে এক ঝাঁক ক্লিষ্টকরুণ মুখ, একরাশ হাহাকার, আর অভিশাপ।

আজীন্দ্র। সংসারে খাঁটি রস ত বড় পাওয়া যায় না। হাস্য-করুণের ভেজাল একটু থাকেই।

মহিম। এতটা করুণ রসের ভেজাল আন্‌তে তোমার বাধে না?

আজীন্দ্র। বাধে বৈ কি। কিন্তু কর্‌ব কি? তাদের দিকে চাইতে গেলে নিজেদের যে বড় বঞ্চিত কর্‌তে হয়।

মহিম। কিন্তু পরের স্বার্থ বাঁচাতে গিয়ে নিজেকে ত ব্যথিত কর্‌তেই হয়।

আজীন্দ্র। পরকে দুঃখ থেকে রক্ষা কর্‌রাই ত তার স্বার্থ বাঁচান নয়।

রামমোহন রায় যে দিন সতীদাহ ওঠাবার চেষ্টা করেছিলেন, সে দিন তিনি কত লোকের মনে মর্ম্মান্তিক আঘাত দিয়েছিলেন, ভেবে দেখ। তাঁর কি উচিত ছিল, এই লোকগুলির মুখ চেয়ে সতীদাহের সমর্থন করা ?

মহিম। স্বর্গের সঙ্গে নরকের তুলনা ?

আজীন্দ্র। নরক কেন বুঝিয়ে দাও। দেখ, আমার নিজের মনেও দ্বিধা আছে। যদি সত্যই বুঝিয়ে দিতে পার, যে অন্যায় করূচি, ত সেই মুহূর্ত্তে তাকে ত্যাগ করূবো, আর তোমাকে প্রাণ খুলে ধন্যবাদ দেবো। পার বোঝাতে ?

মহিম। নিজে যদি না বোঝ ত কে বোঝাবে বল ? তুমি দেখতে পাচ্চ না যে চুরি করূচো ?

আজীন্দ্র। কি রকম ?

মহিম। কি রকম আবার কি। সন্দেশ ভালবাস ব'লে দোকান থেকে তুলে নিতে যাচ্চ।

আজীন্দ্র। সন্দেশের সঙ্গে তুলনা করূলে ত চলূবে না। এ যে মানুষ। এর মন ব'লে একটা পদার্থ আছে। এর নিজের আসক্তি বিরক্তি আছে। এ নিজেই যে আমার দিকে ছুটে আস্‌চে।

মহিম। সে তুমি লইয়েছ ব'লে।

আজীন্দ্র। প্রাণের টান না থাকূলে কি লওয়ান যায় ? তোমাকে তো বোমার মধ্যে টান্‌তে পারিনি।

মহিম। না, এ আমি বুঝ্‌তে পারূচি না। এক জনের ঘর ভাঙ্‌বে তা ব'লে ?

আজীন্দ্র। ঘর ত ভাঙ্‌তেই হয়। তোমার D. L. Ray এর আত্রেয়ী ভিখারীর কাছে মানুষ হ'ল, তার কাছেই বরাবর রইল।

হঠাৎ একদিন চাণক্য 'আত্রেয়ী' ব'লে ডাক দিলেন, আর মেয়েটা আতাপিবাতাপির মত অন্ধের বুক চিরে বেরিয়ে এলো! চাণক্যকে ত পাপী বল না। কসেট্ মেরিয়াসকে নিয়ে মজ্‌ল! এ দিকে বৃদ্ধ জিন্ ভ্যাল্‌জিন্ তার সারাজীবনের সম্বল হারিয়ে হাহাকার করে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো। কসেট্ ও মেরিয়াস্-এর প্রেমকে ত নারকীয় বল না।

মহিম। ভিক্ষুক জান্‌তো আত্রেয়ী তার নয়। জিন্ ভ্যাল্‌জিন্ জান্‌তো কসেট্ একেবারে তার নয়। তাদের একটা সান্ত্বনা ছিল।

আজীন্দ্র। তেমনি প্রত্যেক মানুষের জানা দরকার যে স্ত্রী তার সম্পত্তি নয়। বিয়ে ক'রে ঘরে আন্‌লেই তার সমস্ত দেহ ও মনের ওপর স্বত্ব জন্মায় না। এ রকম স্বত্বের দাবী করা বর্ব্বর যুগের কুসংস্কার। অত্যন্ত দুঃখ দিয়ে এই কুসংস্কার চূর্ণ কর্‌তে হবে। তবে পৃথিবীর দুঃখ ঘুচ্‌বে।

মহিম। এটা হ'ল bomb-thrower's argument. আমার বৌ 'লভ' হবামাত্র যদি আর একজনের সঙ্গে চ'লে যায়, আমি ত সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না।

আজীন্দ্র। আমি পার্‌বো।

মহিম। ওটা তর্কের খাতিরে বল্‌চো।

আজীন্দ্র। তর্কের খাতিরে নয়। সত্য কথাই বল্‌চি। তার মন যদি চলে গেল, ত দেহটাকে ধ'রে রাখ্‌লেই কি রাখা হয়?

মহিম। আমার কিন্তু মনে হয় দেহটাকে ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌লে, দুদিন বাদে, মনটাও পাওয়া যায়।

আজীন্দ্র। ধ'রে রাখ্‌তে চাই না কাউকে! আমি হাড়ে হাড়ে democrat, জুলুম ক'রে কারুর স্বাধীনতা হরণ কর্‌তে পার্‌বো না।

নয়

মহিম তর্ক করে। তাহাকে তর্কে পরাস্ত করা চলে। কিন্তু আর একজন ছিল, যাহার মুখ বন্ধ করা যায় না। একঘেয়ে তার অভিযোগ, নাছোড়বান্দা তার সুর। এ ব্যক্তি আজীন্দ্রের অন্তেশায়ী। তর্ক সে শুনিতে চাহে না। 'Though vanquished, he could argue still.' সে কেবলই বলিতেছে 'তুমি বিশ্বাসঘাতী। ব্রজদুলাল তোমাকে যেরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সে রূপ লইয়া তুমি তাঁহার গৃহে প্রবেশ কর না। তোমার স্বরূপ প্রকাশ করিলে তিনি তোমার হাতে অন্তঃপুরের চাবি দিতেন না।'

ইহারও উত্তর আজীন্দ্রের হাতে ছিল। বিশ্বাসঘাতী ত বটেই। বিশ্বসংসারে সবাই ত বিশ্বাসঘাতী! আশ্রয় পাইবার জন্য যে গৃহ নির্ম্মাণ করিলাম তাহাই মাথার উপর ভাঙিয়া পড়ে। শক্ত মাটি মনে করিয়া যেখানে পা দিলাম, সেখানেই চোরা বালি। এইরূপই ত হইয়া থাকে, —সুগন্ধি কুসুমে কীট, নয়নলোভন ফলে তিক্ততা, মৃতসঞ্জীবনীর মধ্যে মৃত্যুর বীজ। প্রতি পলকে ভুল ভাঙিবার এত আয়োজন থাকিতেও যাহার ভুল ভাঙিল না, এখনও যে অসংশয়ে বিশ্বাস করিতে চায়, তাহাকে বাঁচাইবে কে? সে ত unfit for the struggle for existence."

বলিলে হইবে কি? বহুদিনের বদ্ধমূল সংস্কার। বিশ্বাসঘাতক আখ্যা লইতে মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

কিন্তু এমন হইতেও পারে যে সে বিশ্বাসঘাতী নয়। মাধুরীর সহিত তাহার সত্যকার পরিচয় হয় ত ব্রজদুলালের অগোচর নয়। হয় ত কেন, নিশ্চয়ই। আজীন্দ্রের মনে পড়িল, একবার ব্রজদুলাল তাহাকে

বলিয়াছিলেন, 'তোমাকে দেখে হিংসা হয় হে! পরের বৌয়ের প্রেমে পড়্‌লে কেমন লাগে জান্‌তে ইচ্ছে করে।' আর এক দিনের কথা,—মাধুরীর সহিত তাহাকে খুব কাছাকাছি বসিয়া থাকিতে দেখিয়াই ব্রজদুলাল বাহির হইয়া গেলেন। 'আহা! বসো, বসো। আমি স'রে যাচ্ছি।' এই সেদিন তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া মাধুরীকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। গম্ভীর ভাবে বলিলেন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।' কি কথা হইয়াছিল, আজীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। হয়ত এই সম্বন্ধেই কোন কথা হইয়া থাকিবে।

আঃ! বাঁচা গেল! আজীন্দ্রের আচরণ জালজুয়াচুরীর হীনতা হইতে মুক্ত হইয়া ডাকাতীর পৌরুষে মহিমান্বিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু যে বিবাদ করে না, প্রতিবাদ করে না, তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়াতে ডাকাতীই বা কোথায়? আচ্ছা, বিবাদ করেন না কেন? হইতে পারে তিনি ভীরু, নিজের দখল বজায় রাখিবার জন্য লড়াই করিবার সাহস নাই। হইতে পারে, তিনি তাহারই মতের মতী, স্ত্রীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না।

যাহা হউক, সে বিশ্বাসঘাতী নয়। আজীন্দ্রের দ্বিধাহীন মন এখন হইতে বন্ধনমুক্ত মৃগশিশুর মত ছুটিয়া লাফাইয়া চলিতে লাগিল। এমন সময়ে বাধা আসিল নিতান্ত অস্থান হইতে।

দশ

'দিন ফুরাইয়া আসিল। এ সময়ে বাসনা জ্বালাইতে হয়'। রাজেন্দ্রলাল বাসনা জ্বালান নাই। একটা সিগারেট পুড়াইয়া ছাই করিলেন এবং বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

রাজেন্দ্রের এই প্রাত্যহিক বাহিরে যাওয়ার অর্থ খুব ব্যাপক। ইহা শুধু গৃহের বাহিরে নয়, গার্হস্থ্যধর্ম্মের বাহির, Hygiene ও সমাজ-নীতির বাহির—সকল গণ্ডীর বাহির।

রাজেন্দ্রের যে এই পরিণাম হইবে তাহা পূর্ব্বে কেহ অনুমান করে নাই। তখন দেশের কাজে ইঁহার খুব উৎসাহ ছিল, কাজও করিয়াছেন কিছু কিছু। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মবেগের সহিত অধ্যবসায় ছিল না। তাই প্রথম ব্যর্থতায় একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন। বলিলেন, "Let us eat, drink and be merry."

Merry হইবার উপায় খুঁজিতে হয় না। ওটা সকলেরই মুখস্থ আছে,—খুব কতকগুলা খুবসুরৎ আওরৎ। ইহার মধ্যে পরমনিবৃত্তি না থাকিলে লোকে স্বর্গ-কামনা করিবে কেন? নবাব বাদশা'রা তাঁহাদের অতুল ঐশ্বর্য্য ঢালিয়া ইহার আয়োজন করিবেন কেন? সুখের জন্য অনেকে যেমন করিয়া পানের সহিত তামাকুর পাতা চিবাইয়া রস সংগ্রহ করে, তেমনি করিয়া তিনি এই সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন মুখ টিপিয়া।

মানুষের অধিকার না দিয়া নারীকে শুধু ভোগের বস্তু করিয়া রাখার উপর তাঁহার আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল। অথচ কাজের সময় নিজের মতকে তিনি উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিলেন, নির্বিকার ভাবে। 'যখন কাজে লাগান গেল না, তখন এগুলাকে আপাততঃ ভোগ করা

যাক্।'—এইরূপ তাঁহার মনোভাব। অতি সহজ মনোভাব।—মোটরকার চলিল না, তাই পেট্রল দিয়া কাঁথা সাফ করা।

তিনি যে কাজে হাত দিতেন পূরাপূরি করিয়া তবে ছাড়িতেন। 'Eat, drink and be merry' ব্যাপারেও তাঁহার thoroughness কম ছিল না। প্রথম প্রথম কেহ কেহ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু মুখের কাছে দাঁড়াইতে পারে নাই। কথার আরম্ভেই তিনি লাফাইয়া উঠিলেন, 'ঐ রে! রামকৃষ্ণর ভূত আমাকে পেয়ে বসেছে!'

—'রামকৃষ্ণকে অনেকে অবতার বলে, তা জান?'

—'He was divine. তিনি যা moral code দিয়ে গেছেন তা খুব ভক্তি ক'রে পড়্তে হয়। আমিও পড়িছি। তবে মান্তে পারৃছি না। কারণ তাঁর মত, I have not the bust of a woman.'

—'কিন্তু তিনি ভাল কথাই ব'লে গেছেন।'

—''আর একজন খুব ভাল কথা বলে গেছেন।—তিনি উপদেশ দিয়েছেন, 'চব্বিশ ঘণ্টায় এক বাটি সাগুর অধিক খাদ্য আহার করা মহাপাপ। খাইলে দেহ ক্লিষ্ট, মন খিন্ন ও ধর্ম্ম শীর্ণ হয়।' দেখো যেন ভুলে বেশী খেয়ে ফেলো না, কখনো।''

—'আমি তোমার ভালোর জন্যই বল্তে এসেছিলুম।'

—'Cartainly! এখন যাও, গিন্নির পাশে ব'সে ময়দা বেল গে যাও!'

রাজেন্দ্রকে লইয়া তৃপ্তির মোটে সুখ ছিল না, বলিলে মিষ্ট হইত,—সত্য হইত না। এমন কি, বলিতে লজ্জা করে, স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতায় তিনি মনে মনে একটু গর্ব্বই অনুভব করিতেন। তথাপি সতী স্ত্রীর কর্ত্তব্য এরূপ ক্ষেত্রে খুব খানিকটা হা-হুতাশ করা। তৃপ্তিও তাহা

করিতেন। আজও ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, 'আবার তুমি সেখানে যাচ্ছ!'

রাজেন্দ্র আয়নার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইতেছিলেন। তেমনিভাবেই জবাব দিলেন, 'সেখানে বল্‌চো কেন? কোন এক জায়গায় ত যাই না।'

তৃপ্তি। তোমার লজ্জা করে না?

রাজেন্দ্র। লজ্জাটা অক্ষমের ধর্ম্ম।

তৃপ্তি। অক্ষম হ'তে আর দেরী কত তোমার? বেশী দেরী নেই, তা-জেনে রেখো,—যে রকম অত্যাচার কর্‌চো।

এবার রাজেন্দ্র ফিরিলেন। তৃপ্তির মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন, 'সত্যি নাকি? একবার চেহারাটার দিকে চেয়ে দেখ দিকি,—হ্যাক্, থু! ব'লে ফেলে দিতে ইচ্ছা করে?'

তৃপ্তি। আ ম'রে যাই!—বাঁ দিকের ঝুল্‌পিটা যে খুব্‌লে ফেলা হয়েছে। তাড়াতাড়িতে খেয়াল হ'য় নি বুঝি?

রাজেন্দ্র তাড়াতাড়ি আয়নার দিকে ফিরিলেন। 'তাই না কি? হ্যাঁ—ঠিক ত!—এই—ক্ষুরটা কোথায় ফেল্লুম?—'

তৃপ্তি ক্ষুর ইত্যাদি গুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, 'পড়্‌তে মেম-সাহেবের হাতে ত টের পেতে।'

রাজেন্দ্র। কি হ'ত তা হ'লে? ঘরে ঢুক্‌তে পেতুম না? ঢুক্‌তে দিও না, না হয়। এসে দেখ্‌তুম, প্রিয়তমা পাঁচু দরজীর সঙ্গে নাচ্‌তে গেছেন; তাই না হয় যেয়ো।

তৃপ্তি। একবারে মুঠোর মধ্যে পেয়েছ কি না। তাই এত অত্যাচার কর।

রাজেন্দ্র। আহা, অত্যাচারটা কি কল্লুম? বাইরে দুটো

কাটলেট খেয়ে আসি। তা ব'লে বাড়ীর ঝোলভাতে অরুচি হয়েছে ?

তৃপ্তি। থাক্, আর মিষ্টি কথা কইতে হবে না। রোজকার মত মাতাল হয়ে আস ত, ঘরে ঢুক্‌তে পাবে না, ব'লে দিয়ে গেলুম।

রাজেন্দ্র। হ্যাঁ; তাই কোরো। বারাণ্ডায় আমাদের দুজনের মত বিছানা পেতে রেখো।

এমনি করিয়া তৃপ্তিকে প্রতিদিনই হার মানিতে হয়। কথায় সে পারিয়া উঠে না, স্বামীকে দণ্ড দিতে পারে না; বেশীক্ষণ রাগ করিয়া থাকিবার শক্তিও তাহার নাই। হায়! তাহার মত দুঃখী কে? এই স্বামীর জন্য আজও তাহাকে উৎকর্ণ হইয়া প্রতীক্ষা করিতে হইবে, এবং তাঁহাকে দেখিবামাত্র বুক ভরিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, নিজের অবাধ্য হাসিটুকুও হয়ত চাপিতে পারিবে না। তাঁহাকে বারাণ্ডায় বাহির করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া সে শুইতেই পারিবে না যে!

নিজের এই দুর্ব্বলতায় তাহার কান্না আসিতে লাগিল। তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া আজীন্দ্র প্রশ্ন করিল, 'কি হয়েছে বৌদি ?'

তৃপ্তি। কি আবার হবে ?

আজীন্দ্র। আমাকে বল, বৌদি, কি হয়েছ। বল্‌বে না ?

তৃপ্তি। রোজ যা হয় তাই হয়েছে। এ আবার বল্‌বো কি ?

আজীন্দ্র। দাদা কিছু বলেছেন ?

তৃপ্তি। বল্‌বেন কেন ? কি কর্‌চেন দেখ্‌তে পাচ্চিস্ না ?

আজীন্দ্র। সত্যি, তাঁকে নিয়ে তুমি কখনো সুখী হ'লে না।

তৃপ্তি। সুখ! চিতায় ওঠবার আগে আর তা হবে না।

আজীন্দ্র। অথচ ঐ লোকটির জন্য তুমি হাহাকার ক'রে বেড়াও।

তৃপ্তি। মরণ আর কি! হাহাকার ক'রে বেড়াব! আমার

ইচ্ছে করে এখুনি ঘরে দোরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে কোথাও চ'লে যাই।

অজীন্দ্র। তা কোথাও যাও না কেন?

তৃপ্তি। যাব কোন্ চুলোয়, বল্?

আজীন্দ্র। কেন, তোমার দাদার কাছে?

তৃপ্তি। তুই আর বকাস্‌নে, যা।

আজীন্দ্র। সত্যি, বৌদি, আমি এ সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না। দাদাকে একদিন দুকথা শুনিয়ে দোবো।

তৃপ্তি। তোকে আর শোনাতে হবে না, যা। তোর নিজের গুণেরও ত ঘাট নেই।

আজীন্দ্র। কেন?—কেন?—আমি কিছু করিচি?

তৃপ্তি। কি আবার কর্‌বি, শুনি? একটা ভদ্রঘরের বৌএর সঙ্গে—! আর, মাধুরীই বা কি রকম মেয়েমানুষ তাই ভাবি।

তৃপ্তির সমস্ত রাগটা পড়িয়াছিল মাধুরীর উপর। পুরুষ ত ব্যভিচারী হইয়াই থাকে। গোঁফ গজানোর ন্যায় এই প্রবৃত্তিও তাহাদের স্বাভাবিক। তাহাদের এই দোষটার দিকে নজর দিতে নাই। তাহাদের চরিত্রের এই দিকটা বুঝিবার শক্তিও নারীর নাই। কিন্তু মাধুরীর পক্ষে এটা যে অত্যন্ত অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক। সে পুরুষের মত আচরণ করিতে চায় কি বলিয়া? তাহাকে ক্ষমা করিবে কে

আজীন্দ্রের প্রেমলীলা তৃপ্তির গোচর হইয়াছে জানিয়া সে বিশেষ ব্যথিত হয় নাই। তাহার আঘাত লাগিল দাদার সহিত তাহার আচরণের তুলনা করা হইয়াছে বলিয়া।

সে একটা জবাব দিবে দিবে করিতেছে, এমন সময়ে রাজেন্দ্র ভিতর হইতে হাঁক দিলেন, 'কে, আজীন না? একটা কথা আছে।'

আজীন্দ্র দাদার সম্মুখে উপস্থিত হইতেই তিনি বলিলেন 'একটা married woman নিয়ে এমন জড়িয়ে পড়্‌লে কেন ?'

আজীন্দ্র। আপনি বল্‌চেন ?—

রাজেন্দ্র। আমি যা বল্‌চি, তা সকলেরই জানা কথা। তুমি ত লুকোবার কোন পথ রাখনি। অমন বোকামী কর কেন ?

আজীন্দ্র। প্রেমকে ত লোকে বোকামী ব'লেই থাকে।

রাজেন্দ্র। ও! প্রেম! পবিত্র প্রেম!—দেখ, প্রেম জিনিসটা আগুনের মত পবিত্র। ও নিয়ে খেলা কর্‌তে হ'লে খোলা জায়গায় করা ভাল। কারুর ঘরের ভেতর কর্‌তে নেই।

আজীন্দ্র। আপনি যা বল্‌চেন, সেটাকে অতি হীন কাজ মনে করি।

রাজেন্দ্র। You do, do you ? হা হা হা হা হাঃ! যাক্! আপাততঃ এই স্বামীটাকে পাগল করেছ ?

আজীন্দ্র। আমি ত কোন পাপ করি নি। সে যদি jealousyর বশে—

রাজেন্দ্র। হাঁ, সে যখন jealousyর বশে কষ্ট পাবে, তখন সেই কষ্ট transmitted হবে ঐ womanটার ওপর,—your sweetest darling!

এদিকটা আজীন্দ্র কখনও ভাবিয়া দেখে নাই। বাস্তবিক চরিত্রে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, বর্ব্বর পুরুষ স্ত্রীর প্রতি যে অত্যাচার করিতে পারে তাহার ত সীমা নাই। মাধুরীর উপর এতদিনে নিশ্চয়ই উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছে। তাহার মুখে ইদানীং সে একটা ভীত চকিত ভাবও লক্ষ্য করিয়াছে। সে দিন ব্রজদুলাল যখন মাধুরীকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন, তখন সুলভ হাসির মুখোসটাও বজায় রাখিতে পারেন নাই। মাধুরী কেমন করিয়া দিন কাটাইতেছে, কে জানে ?

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া রাজেন্দ্র খুব সহজ ভাবে বলিয়া গেলেন, 'Give her up.'

—Give her up।

বলা কত সহজ।—

করাও খুব সহজ, যদি ভালবাসিবার তাগত থাকে। "মাধুরী, মাধুরী, মাধুরী, 'তোমারে যে ছেড়ে যাই সে তোমারই প্রেমে'।"

* * * *

এই সময়ে গান্ধিজীর Non-co-operation আন্দোলনে সমস্ত ভারতবর্ষ উচ্চকিত হইয়া উঠিয়াছে। দুস্তর সমুদ্রে life-buoy এর মত আজীন্দ্র ইহাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। অনন্য-কর্ম্মা হইয়া চরকা খদ্দরে মাতিয়া গেল।

এগারো

চৌধুরীদের চালচলন সাধারণ গৃহস্থের মত হইলেও, তাঁহাদের ব্যাঙ্কে জমান টাকা না কি ছিল বিস্তর। এই টাকাটার প্রকাশ যত কম, খ্যাতি তত বেশী ছিল।

ইহার ইতিহাস সম্বন্ধে লোকে বলিত, 'সে অনেক কথা।' অর্থাৎ এবিষয়ে যত কথা শুনা যায় তার চেয়ে বেশী কথা আছে; এবং যত কথা আছে, তার বেশী কথা শুনা যায়।

এই বংশের কে একজন না কি ব্যাঙ্কে কর্ম্ম করিতে করিতে একটা মোটা অঙ্কের টাকা সরাইয়া ফেলেন, লক্ষ্মীর বাহনটাকে দুই শক্ত মুঠায় ধরিয়া আনিয়া রাতারাতি নিজের ব্যাঙ্কবুকের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া

ফেলেন,—কয়েক শত বিঘা জমিজমার উপরেও তাহাকে একদিনের জন্ম ছাড়িয়া দেন নাই। আর এক ধুরন্ধর অনেক টাকার নোট জাল করিয়া জেল খাটিয়াছিলেন,—এমন কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। যাহ হউক, জেলের ঘায়ে জাল ছিঁড়িয়া গিয়াছে। বাকী ছিল নোটগুলা সে গুলাও কবে রূপার টাকায়, এবং সোণার মোহরে পরিণত হইয়াছে কেহ খবর রাখে না। সোণায় কলঙ্ক ধরে না। তাই আজ ব্যাঙে জমান যে টাকা লইয়া চৌধুরীদের সুনাম, সে টাকা লোকের চক্ষে নবজাত শিশুর মতই নিষ্কলুষ।

রাজেন্দ্রের পিতা সমরেন্দ্রের হাতে আসিয়া এই সম্পত্তি অনেকট পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। কারণ তাঁহার বিষয়বুদ্ধি খুব প্রখর ছিল তিনি দাঁও বুঝিয়া টাকা ধার দিতেন, এবং খুব চড়া হারে সুদ আদা করিতেন। এদিকে খরচের দিকে চলিতেন খুব হিসাব করিয়া টাকা আনা পাইএর অঙ্কগুলার উপর দিয়া তাঁহার মন সকল সময়ে Parisএর traffic rules মানিয়া চলিত—Keep to the right.

এক কথায়, সমরেন্দ্রের মত কৃপণ লোক সচরাচর দেখিতে পাওয় যায় না। কৃপণের উপর দেবতারাও সন্তুষ্ট ন'ন। তাঁহারা দণ্ডে ব্যবস্থা করিলেন। তবে দেবতার দণ্ড যেমন হইয়া থাকে, রামে বদলে শ্যামের ঘাড় ভাঙা,—তাহাই হইল। সমরেন্দ্রের নাম করিয় লোকের হাঁড়ি ফাটিতে লাগিল,—সেদিনে না হউক, কয়েক মাসে মধ্যেই। শুধু হাঁড়ি নয়, একবার একজনের মাথাও ফাটিয়াছিল। সে ছিল সমরের কোচমান। ঘোড়া সাম্‌লাইতে না পারিয়া কোচবা হইতে পড়িয়া যায়। সে ব্যক্তিও সমরের নাম করিয়াছিল। তবে মাথা ফাটিবার পূর্ব্বে নয়, কিছু পরে,—হাঁসপাতালে নিজের পরিচ দিবার সময়।

ঐশ্বর্য্যের সহিত যে কয়টা বদখেয়ালী ও বাজে খরচের নিত্যসম্বন্ধ থাকা সঙ্গত, তাহার কোনটাই সমরেন্দ্রের ছিল না। তবে ব্যাঙ্কে টাকা থাকিলে একটা বাতিক রাখিতে হয়। সমরেন্দ্রের বাতিক ছিল ছেলেদের Education। এ বিষয়ে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, বিবিধ কলাবিদ্যার সরঞ্জাম, দেশবিদেশের Relief map, চিত্র, পুস্তক ও খেলানা, কলকজার নক্সা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও charts, ও Biologyর models, bioscope ও lantern slides, এমনি কত আজগুবি কাণ্ড!

বংশের মধ্যে তিনিই প্রথম উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ইহাতে হয়ত কিছু আনন্দ পাইয়া থাকিবেন। এই আনন্দের আস্বাদ ছেলেদেরও দিতে চাহিয়াছিলেন। তখন তিনি জানিতেন না যে এই শিক্ষাই তাঁহার কাল হইবে। জানিতেন না যে শিক্ষার একটা ফল অবাধ্যতা। মনের মত কৌটার মধ্যে যদি বীজকে ধরিয়া রাখিতে হয়, তবে তাহার শিকড় গজাইতে দেওয়া উচিত নয়। শিকড় গজাইলে চেহারাটা যে কিরূপ দাঁড়ায় তাহা তিনি বেশ ভাল করিয়াই টের পাইয়াছিলেন আজীন্দ্রের দ্বীপান্তরে।

দ্বীপান্তরের শিক্ষা—আজীন্দ্রকে মানুষ করিয়া দিবে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইবার পূর্ব্বেই সে Non-co-operationএ যোগ দিল। ইহাতে সমরেন্দ্রের উৎকণ্ঠার অবধি রহিল না।

তিনি বরাবর ডেপুটি দিয়া কাজ করিয়াছেন। ছেলেদের সহিত এমন হৃদ্যতা ছিল না, যে তাহাদের সঙ্গে সোজাসুজি কথা ক'ন।

তাই বিনয় ও বঙ্কিমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইঁহাদের sanity sobrietyতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল।

বারো

সমরেন্দ্র বলিলেন, 'এই ছেলেদের নিয়ে কি করি বল ত? বড়টি ত স্বদেশী ক'রে অনেকগুলি টাকা উড়িয়েছেন। এখন নেশা ভাং নিয়ে পড়েছেন। সে বরং ভাল। ইংরাজ-রাজত্বে বাস কর্‌বো, আর থেকে থেকে তাকে কুটুস্ কুটুস্ ক'রে কামড়াব, এর চেয়ে বোকামী আর নেই। আর এই আজীনটা,—সে দিন আণ্ডামান থেকে ফিরে এলো, তবু চৈতন্য নেই। আবার দেশোদ্ধার নিয়ে মেতেছে। আমি ডেকে পাঠিয়েছি। তোমরা তাকে একটু বুঝিয়ে স্থঝিয়ে বল।—আচ্ছা, কি মনে করে ওরা? তুড়ি দিয়ে ইংরাজকে উড়িয়ে দেবে?

বিনয়। না, সে কথা ওরাও মনে করে না। তবে দেশের দুঃখ-দুর্গতি দেখে সব সময়ে মাথা ঠিক রাখতে পারে না। মনে করে, সকল দোষ বুঝি ইংরাজ রাজত্বের।

সমর। দেশের দুঃখই যদি দূর করতে চান, ত ব্রাভাডো ক'রে কি হবে?

বিনয়। কিছুই হবে না। তবে ব্রাভাডো করাটা সহজ।

বঙ্কিম গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, 'কেবল দুঃখ-দুর্গতি! ইংরাজের দোষে কি দুঃখ-দুর্গতিটা হয়েছে, শুনি?'

বিনয়। দুঃখ আছে বৈ কি। অর্দ্ধেক লোক খেতে পায় না।

বঙ্কিম। খেতে পায় না, না চায় না? আমাদের শতকরা নিরেনব্বুই জন শুধু ব'সে থাকে, তা জান? নিছক ব'সে থাকে, দিনের পর দিন। বাড়ীর পাশে আশ্‌শেওড়ার বন ক'রে রাখে, দুটো বেগুন ফলিয়ে খায় না। চার পয়সায় আমাদের পেট চ'লে যায়। এই চার পয়সা রোজগার করা যায় না, এত কম্‌পিটিশন আছে এ দেশে?

বিনয়। চার পয়সায় পেট চালান ত খুব সুখের নয়, পৃথিবীর বাকী লোকগুলো যখন পেট ভরায় চার টাকায়।

বঙ্কিম। তোমরা আধ্যাত্মিক জাতি। চার পয়সার বেশী খেতে পারবে না। লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করলেও তোমাদের লোটা-কৌপীন, ছাতু-চত্বর ঘুচবে না। টাকাটা খরচ হবে শুধু বাগানবাড়ীতে।

এই সময় আজীন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল।

সমরেন্দ্র তাহাকে বলিলেন, 'দেখ, তুমি আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছ। এখন মরতে বসেছি। এ সময়টায় একটু দয়া কর। আর মিথ্যা হাঙ্গামা বাঁধিয়ে আমাকে ভুগিও না।'

আজীন্দ্র। কোন হাঙ্গামা বাঁধাইনি ত।

সমর। দেখ তুমি দাগী আসামী। তোমার খুব সাবধানে থাকা উচিত।

আজীন্দ্র। সাবধানেই ত আছি।

সমর। এই যে Non-co-operation নিয়ে মেতেছ, শুনলুম।

আজীন্দ্র। সেটাকে কি এতই অন্যায় কাজ মনে করেন? বোমা ছুঁড়চি না। কারুর সঙ্গে শত্রুতা করচি না। নিতান্ত নিরীহভাবে আমাদের এই অনশনক্লিষ্ট দেশবাসীর মুখে দুটো অন্ন দেবার চেষ্টা করচি। এও কি একটা গর্হিত কাজ?

বিনয়। কিন্তু Non-co-operation এর যুদ্ধসাজ প'রে কিছু-করতে পারবে না ত!

আজীন্দ্র। আপনি জানেন, এটা non-violent non-co-operation.

বঙ্কিম। Non-violent! এত বড় জুলুম আমি দেখিনি কখনো। লোকের পায়ের কাছে প'ড়ে, তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়নি।

বিনয়। আমি বল্‌চি এই non-violent non-co-operationই যুদ্ধসাজ। ইংরাজকে জব্দ কর্‌বার জন্য তোমরা এ সাজ পরেছ।

আজীন্দ্র। আপনি তা হ'লে কি কর্‌তে বলেন ?

বিনয়। আমার কথা তোমার ভাল লাগ্‌বে না।

আজীন্দ্র। তবু বলুন না।

বিনয়। আমি হ'লে 'লয়েল' হয়ে কাজ করতুম।

আজীন্দ্র। পরের বারে একটু বেশী সুবুদ্ধি নিয়ে জন্মাতে পারি ত চেষ্টা ক'রে দেখবো।

বিনয়। অবশ্য যদি নিজেকে কাজের চেয়ে ভালবাস ত স্বরূপ গোপন কর্‌তে বল্‌তে পারি না। আর যদি কাজ চাও ত কাজের জন্য একটু আত্মগোপন কর্‌তে হয়; ছলচাতুরী ফিকিরফন্দি কর্‌তে হয়।

আজীন্দ্র। আপনি যাকে কাজ বল্‌চেন, সেটা একেবারেই কাজ নয়। ছলচাতুরী, ফিকিরফন্দি ক'রে দুটো চাক্‌রী বেশী পাওয়া যেতে পারে। দেশের কোন স্থায়ী কল্যাণ করা যাবে না। আমাদের সকল অকল্যাণের মূল হচ্চে, ভয়। ভয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে আছি ব'লেই ইংরাজ তার hobnailed ammunition বুট প'রে আমাদের মাথাগুলো মাড়িয়ে চলেছে। ভয়ের আশ্রয় নিয়ে দেশের কোন উপকার কর্‌তে পার্‌বো না। Non-co-operation-এর সাহায্যে তাকে নির্ভীকভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ কর্‌তে পার্‌লে, হয়ত কোন ফল পাওয়া যাবে।

সমর। ঐ দেখ আবার সেই non-co-operation –

আজীন্দ্র। গান্ধিজী বলেছিলেন, এই non-co-operation চালালে এক বৎসরে ভারত স্বাধীন হবে।

বিনয়। মহাত্মা গান্ধী ঠিক কথাই বলেছেন। non-co-

operationই ভবিষ্যতের একমাত্র যুদ্ধাস্ত্র। এই non-co-operation চালালে এক বৎসর কেন, এক সপ্তাহে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। তবে কি জান? Non-co-operation has no meaning unless it is massive. এই massive non-co operation এর মূলে যে শিক্ষা ও দেশাত্মবোধ থাকা দরকার, তা যদি দেশে থাক্‌তো, ত Non-co-operation না কল্লেও ইংরেজ চ'লে যেত, এবং, চ'লে না গেলেও দেশ স্বাধীন হ'ত।

আত্মীন্দ্র। দেশাত্মবোধ আমরা জাগাব। আমরা বোঝাব যে এই আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ আমাদের দেশ। ভারতবর্ষ, তার অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-দ্রাবিড় নিয়ে, তার হ্রদ-নদ-মরু-পর্ব্বত নিয়ে, তার বিবিধ ভাষা, পরিচ্ছদ ও ধর্ম্মসম্প্রদায় নিয়ে আমার দেশ। এই দেশের মধ্যে নির্ভয়ে চলাফেরা কর্‌তে চাই, স্বোপার্জ্জিত অন্ন নিরুদ্বেগে আহার কর্‌তে চাই, এবং ছেলেপুলেদের নিজেদের হাতে নিজেদের মনের মত ক'রে মানুষ কর্‌তে চাই। আমরা রাজ্যবিস্তার চাই না, দিগ্‌-বিজয় চাই না, ইংরাজকেও বিপন্ন কর্‌তে চাই না। বিশ্বমানবসমাজে একটি শান্ত পরিবারের মতই বসবাস কর্‌তে চাই। এই আমাদের সাধনা। যতখানি দুঃখই বহন কর্‌তে হোক্‌, যতখানি দণ্ডই বরণ কর্‌তে হোক্‌, কর্‌বো। কিন্তু কিছুতেই স্বীকার কর্‌বো না, যে মানবমাত্রের সাধারণ অধিকারে আমাদেব পূর্ণ দাবী নেই।

বিনয়। তোমার আদর্শকে খর্ব্ব ক'র্‌বো না। কিন্তু এই যে বিবিধ ভাষা, পরিচ্ছদ ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কথা বল্লে, এসব এদেশে আছে, তার কারণ, এদেশের অনেকে নিজেদের ভাষা, পরিচ্ছদ ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে exclusively ভালবাসে। এই উগ্র clannishness থাক্‌তে তাদের মনে বৃহত্তর ভারতের পরিকল্পনা জাগ্‌তে পারে না।

আজীন্দ্র। আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসি। তাই ধুতিচাদর ভালবাসি না?

বঙ্কিম। না। ভারতবর্ষের জন্য, প্রয়োজন হলে, তুমি লুঙ্গি পর্‌তে পার, ট্রাউজার পর্‌তে পার, বেদ পড়্‌তে পার, কল্‌মা পড়্‌তে পার। বল, পার কি না!

আজীন্দ্র। তা পারি।

বিনয়। সকলে কিন্তু পার্‌বে না। যতদিন না পার্‌বে, ততদিন ইংরাজের থাকা দরকার। সে চ'লে গেলেই এই বিবিধ ভাষা, পরিচ্ছদ ও ধর্ম্মসম্প্রদায় পরস্পরের সঙ্গে লাঠালাঠি ক'রে মরবে। এখন তাই স্বাধীন হবার চেষ্টা না করাই সুবুদ্ধি!

আজীন্দ্র। নিশ্চেষ্ট হ'য়ে থাকৃতে বলেন।

বিনয়। রোগের ঠিক ওষুধটি হাতের কাছে না পাওয়া পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট হ'য়েই ত থাকৃতে হবে। যা'তা' ওষুধ দিলে ত চল্‌বে না।

আজীন্দ্র। ও কথা আপনি বলতে পারেন। রোগীর সঙ্গে যার হৃদয়ের যোগ নেই, সে বলতে পারে। কিন্তু রোগকাতর শিশুর আর্ত্তনাদ শুনে কোন মা কি এই তত্ত্বকথা ভেবে শান্ত হ'তে পার্‌বেন! তিনি চঞ্চল হবেনই, ছুটাছুটি কর্‌বেনই। ব্যর্থ চেষ্টার আবেগই তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা।

আজীন্দ্র প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিল।

কিন্তু বিনয় ছাড়িলেন না। বলিলেন, 'একটা কথা মনে রেখো, আবেগের নাম স্নেহ নয়। যারা দুর্ব্বল, যাদের প্রাণের গভীরতা কম, তারাই অধৈর্য্য প্রকাশ করে। তাতে রোগীর উপকার হয় না। ক্ষতি হ'তে পারে। রোগীকে যদি সত্যই ভালবাস, ত অস্থির হ'লে চল্‌বে না। শান্ত সংযত হ'য়ে পাশে ব'সে উপায় চিন্তা কর্‌তে হবে।'

বঙ্কিম। আমার কথাটাও ব'লে রাখি,—স্বাধীনতাই পরমপুরুষার্থ নয়। আরব বেদুইন হওয়া কবিতাতেই মানায়, সত্যি সত্যি ওরকম হ'তে গেলে মারা যাব।

বিনয় বঙ্কিমেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, 'হাঁ, ভদ্রভাবে বাঁচ্‌তে হবে। তার জন্য টাকা চাই। টাকা পেতে হ'লে দেশের resources develop কর্‌তে হবে, পরের কাছে ধার কর্‌তে হবে, তার সুদ দিতে হবে, in some form, যেমন ইংরাজকে দিচ্চি। আজ যদি সত্যই ইংরাজ আমাদের ছেড়ে চ'লে যায়, ত কাল আমাদের পরের দোরে গিয়ে ধন্না পাড়্‌তে হবে,- টাকার জন্য, in other words, দাসত্বের জন্য।'

অত্যন্ত বিরক্তির সহিত আজীন্দ্র কথাগুলি শুনিল। কোন জবাব দিল না।

ভেরো

যে সত্যকে চায়, সে তর্ককে ডরায় না। কারণ তর্কের দ্বারাই সত্য আবিষ্কৃত হয়, এবং না হইলেও কোন ক্ষতি নাই। প্রতিদিবসের প্রতিকাজে আজীন্দ্র এ কথা মানিয়া চলিত। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মানিত, যে কতকগুলি সত্য কাহারও কাহারও মনে আপনি গজায়, তর্কের আশ্রয় না লইয়াই।

এই সব 'প'ড়ে-পাওয়া' সত্য, আসল নয় বলিয়াই হয়ত, পোষ্য-পুত্রের মত আদুরে হইয়া উঠে অতি সাবধানে ইহাদের লালন করিতে হয়। তর্কের দ্রংষ্ট্রাঘাতে ইহাদের গায়ে আঁচড় লাগিবার সম্ভাবনা দেখিলেই রক্ত গরম হইয়া উঠে। আসল সত্যের প্রতি লোকের

এতটা মমত্ব থাকে না। এই কারণেই বিনয় বা বঙ্কিমের কথায় আজীন্দ্র অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা যে নিতান্ত অযৌক্তিক কথা বলিয়াছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু নিজের সহজাত সত্যের বিরুদ্ধে সে যুক্তিপূর্ণ কথাই বা শুনিবে কেন? তাহার মন বলিতেছে, গ্রামে গিয়া Non-co-operation প্রচার করা তাহার ধর্ম্ম। ইহাতে দেশের কল্যাণ হইবে। সত্য কতটা কল্যাণ হইবে, কিছু কল্যাণ হইবে কি না, এ তর্ক সে নিজে করে না। পরকে করিতে দিবে কেন?

সে ত ফলপ্রাপ্তির আশা করিয়া এ কাজ করিতেছে না। সে কাজ করিবে শুধু কাজের জন্য, একেবারে নিষ্কাম কর্ম্ম।

সে ভাবিয়া দেখে নাই, যে, তাহার এই নিষ্কাম কর্ম্মের উদ্দেশ্য ছিল দুর্বিনীত মনটাকে নিশ্ছিদ্রভাবে নিরাপদ কাজের মধ্যে চাপিয়া রাখা,—উপদ্রবী ভূতটাকে বালির দড়ি গড়িতে দেওয়া।

মাধুরীর সহিত দেখাশুনা বন্ধ করিতে হইবে। কলিকাতায় থাকিয়া এ কাজ যে কত শক্ত, তাহা আজীন্দ্রের চেয়ে বেশী বুঝিবে কে? তৃপ্তি বিবাহের জন্য আজকাল যেরূপ পীড়াপীড়ি করিতেছেন তাহাতেও কলিকাতায় বাস করা অসম্ভব। ইহার উপরে আছে পিতার আজ্ঞা, দাদার শ্লেষ, বন্ধুদিগের উপদেশ, বোকার বক্তৃতা ও বিজ্ঞের বুজ্‌রুকী। এসব এড়াইতে হইলেও গ্রামে গিয়া বাস করিতে হয়। সেখানে থাকিয়া কাজও বেশী করা যাইবে নিশ্চয়।

আজীন্দ্রের দেশহিতৈষা প্রবল। সেই হিতৈষাকে উত্তুঙ্গ করিয়া তুলিয়াছে ঐরূপ কয়েকটা ছোটখাট ব্যাপার;—বিশাল প্রবালদ্বীপের মূলে অযুত কোটি কীটের কঙ্কাল!

মাধুরীকে সে ছাড়িয়াই দিল। আজিকার মত, কালিকার মত, ইহকালের মত, চিরকালের মত, সে ছাড়িয়া চলিল। একবার শেষ

দেখা করিতে দোষ কি? আর ত সে তাহার কোন ক্ষতি করিবে না। আর ত তাহার শান্ত নীড়ের উপরে কৃষ্ণ ছায়া ফেলিয়া আতত-স্তব্ধপক্ষ শ্যেনের মত উড়িবে না। শুধু একদিনের জন্য,—অনন্তের কূলে দাঁড়াইয়া, শুধু ক্ষণিকের জন্য তাহার মুখের দিকে চাহিয়া লইতে দোষ কি?—আহা! মাধুরীর হাসিভরা মুখখানি কি সুন্দর!

—আজও সে হাসি থাকিবে কি?

মাধুরী মনে মনে কি একটা সুর আবৃত্তি করিতে করিতে হার্মোনিয়ামের রীড্‌গুলা টিপিয়া যাইতেছিল। পরিবারবর্গের টিট্‌কারীর ভয়ে সে আজকাল আর বাজাইতে সাহস করে না। সুরের ভারে সে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। যন্ত্রের কাছে কান রাখিয়া, আনিমীলিত নেত্রে সে যে কি শুনিতেছিল, সেই জানে।

'বিদায় নিতে এলুম, মাধুরী,' বলিতে বলিতে আজীন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিল।

মাধুরী কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিল না। সোজা হইয়া বসিয়া, সহজভাবেই বলিল, 'আসবার কি দরকার ছিল? বিদায় নেওয়া ত হয়ে গেছে।'

আজীন্দ্র। হ্যাঁ, অনেক দিন আসি নি।

তারপর একটু হাসিয়া বলিল, 'তোমার জন্যই, কিন্তু।'

মাধুরী। বুঝ্‌তে পারলুম না।

আজীন্দ্র। ভেবে দেখ্‌লুম আমি তোমাকে সুখী কর্‌তে পার্‌বো না। কেবল তোমার দুঃখ বাড়াব।

মাধুরী। সেই কথা বল্‌তে এলে?

আজীন্দ্র। না, ঠিক তা নয়। আমি চ'লে যাচ্চি। তাই দেখা ক'রে গেলুম।

মাধুরী। কোথায় যাবে?

আজীন্দ্র। গ্রামের মধ্যে গিয়ে বাস ক'র্‌বো। চর্‌কা কাট্‌বো। আর চাষাভুষোদের সঙ্গে দেশের কথা কইব।

মাধুরী। আবার দেশের কথা?

আজীন্দ্র। হাঁ, মাধুরী, সর্ব্বনাশী আবার আমায় ডাক দিয়েছে।

মাধুরী। সেদিন আণ্ডামান থেকে ফিরে এসেছ—তোমার ভয় নেই?

আজীন্দ্র। ভয় নেই? ভয় আছে ব'লেই ত যাচ্চি,—ভীতিস্তম্ভিত কাঠবিড়ালীর মত অজগরের মুখের মধ্যে।—পালাতে পার্‌লুম না যে!

মাধুরী। আমি যদি বলি, যেতে দেবো না।

আজীন্দ্র। না, মাধুরী, তুমি এমন কথা বল্‌বে না, আমি জানি।

মাধুরী। না, তুমি জান না। আমি ঐ কথাই বল্‌বো।

আজীন্দ্র। মাধুরী,—মাধুরী,—

মাধুরী। আমার কথা রাখ্‌বে না ত?

আজীন্দ্র। দেখ, জেলকে ভয় করিনি। দ্বীপান্তরকে ভয় করি নি। আমি ভয় করি তোমাকে। তুমি আমার দেশের শত্রু, আশার অন্তরায়। আমার সমস্ত মনের তেজ এক ফোঁটা চোখের জলে নিঃশেষ ক'রে দিতে পার। রক্ষা কর। আমাকে ছেড়ে দাও। ব্যর্থতার মহাপঙ্কে আমাকে ডুবিয়ে রেখো না,—আমি তোমায় ভালবাসি।

মাধুরী। ভালবাসার কাজ ত ক'রেছ। আমাকে সর্ব্বনাশের মধ্যে ফেলে, নিজে হাসিমুখে ছুটে চ'লেছ, চিরাকাঙ্ক্ষিত সার্থকতার দিকে!

আজীন্দ্র। আমি অন্যায় করেছি, অন্যায় করেছি,—ক্ষমা কর। স্নেহ, প্রেম, আমার জন্য নয়।

মাধুরী। আর—মনুষ্যত্ব?

আজীন্দ্র নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মাধুরী। মনুষ্যত্বও তোমার জন্য নয়?

আজীন্দ্র। না।—না, না, না। দেশের জন্য সব জলাঞ্জলি দিতে হয়। মনুষ্যত্বও।

মাধুরী। তাই বুঝি আমার স্পন্দিত হৃৎপিণ্ডকে নখ দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেলা কর্‌লে!

আজীন্দ্র। মাধুরী, দেশের জন্য নিজেকে রেহাই করিনি। তোমাকেও রেহাই দিলুম না।

মাধুরী। তুমি ত মাটির দেশ নিয়ে মজ্‌বে, আমার কি রইল?

আজীন্দ্র। তোমার স্বামী রইল, ঘর রইল।—

মাধুরী। কাঠের ঠাকুর, সে সব কি রেখেছ? আগুন ধরিয়ে দিয়েছ যে!

আজীন্দ্র। আবার মিলে মিশে থাক্‌তে পার্‌বে না? ক্ষতি যা ক'রেছি, সে সব মুছে ফেলে, আবার পুরাতনের মধ্যে ফিরে যেতে পার্‌বে না?

মাধুরী। তাই মনে কর, না? তাই হেলায় ফেলায় দু' হাতে সব ভেঙে চ'লেছ,—বিশ্বাস আছে তারা আপনা আপনি আবার গ'ড়ে উঠ্‌বে।—তা হয় না।

আজীন্দ্র। তা হ'লে, ক্ষমা চাইবারও অবকাশ নেই। হাতের বোমায়, না হয়, আর একটি নিরীহ প্রাণীকে অকারণে হত্যা কর্‌লুম!—কিন্তু যেতে হবে। 'অমর মরণ রক্ত চরণ নাচিছে সগৌরবে।'

মাধুরী। যাও, যাও, যাও! নিমেষের অভিশাপ,—আমাকে চিরকালের মত পাষাণ ক'রে রেখে যাও!

সকল অপরাধ মাথা পাতিয় লইবার জন্য আজীন্দ্র মাথা নত করিল, এবং নত মস্তকেই দ্রুত প্রস্থান করিল।

চৌদ্দ

আজীন্দ্রকে মাধুরী ভালবাসিত। নিজের উদ্ভিন্ন যৌবনের সমস্ত আকুলতা দিয়া সে তাহাকে বরণ করিয়াছিল। এবং এ কথাটা পিতামাতার কাছেও গোপন করে নাই। তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়াই সমরেন্দ্র বিবাহে সম্মতি দেন, যদিও দুই পক্ষের bank-balance-এ যথেষ্ট পার্থক্য ছিল।

আজীন্দ্র স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিবে, আর সে হইবে তাহার সহায়; মুখের কথায়, চোখের ইঙ্গিতে, অঙ্গের স্পর্শে সে তাহার বাহুতে শক্তি দিবে, প্রাণে উৎসাহ দিবে; নিজের মাথার কেশ বিনাইয়া সে তাহার ধনুতে ছিলা পরাইবে; তাহার বিজয়রথের মত্ত অশ্বদুটাকে ছুটাইয়া লইয়া যাইবে, একেবারে শত্রুব্যূহের বুকের উপর দিয়া;—এই রকম কত শত কল্পনা তাহার মনে আসিত। তখন মাধুরীর চরমপন্থিত্বে আজীন্দ্রও শিহরিয়া উঠিত। কিন্তু আজীন্দ্র বোমার দায়ে চালান গেল সাত সমুদ্র তের নদীর পার, আর মাধুরী ঘরের কোণে বসিয়া রহিল, কুরুবকাটি হাতে করিয়া।

আজীন্দ্রকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণটা ছুটাছুটি করিয়াছিল, সত্য। কিন্তু কিছু করিতে পারে নাই,—কর্ত্তার ইচ্ছা। বোমার আসামীর সহিত তাহার পিতা কোন সম্পর্ক রাখিতে চান না।

মাধুরীর ইচ্ছা করিতে লাগিল, রাজপুত রমণীদের মত জলন্ত আগুনে ঝাপাইয়া পড়ে, এবং নিজের দেহমুক্ত আত্মাকে আজীন্দ্রের সম্মুখে হাজির করিয়া বলে, "ওগো, আছি, আছি, আছি। দিবস-রজনী আমি তোমাকেই ঘেরিয়া আছি। সুখে, দুঃখে, উত্থানে, পতনে, আমি একান্তই তোমার।"

একদিন আগুন জ্বলিল, হবি পুড়িল, শাঁখও বাজিল অনেকগুলা। কিন্তু সে জহরব্রত করিল না। একজন লোমশ পুরুষের কর্ম্মকর্কশ হাতের উপর হাত রাখিয়া কতকগুলা অনুস্বারের টঙ্কার শুনিল, এবং পরদিন 'দ্বিধায় জড়িত পদে, কম্প্রবক্ষে, নম্রনেত্রপাতে', রক্তপট্টাম্বর-নিপীড়িত দেহযষ্টিখানি বহন করিয়া ব্রজদুলালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল।

আজীন্দ্রের বদলে আর কাহাকেও হৃদয় দান করিতে পারিবে, একথা মাধুরী ভাবিতে পারে নাই। তাই ব্রজদুলালের সহিত বিবাহের প্রস্তাবেই সে প্রতিজ্ঞা করিল, আত্মহত্যা করিবে, দেশত্যাগ করিবে, বা ঐ রকম দুঃসাহসিক একটা কিছু করিয়া বসিবে। কিন্তু কিছু করে নাই, শুধু বিবাহ হইয়া গেল বলিয়া।

ব্রজদুলালকে সে অনেকদিন হইতেই চিনিত। তাঁহাকে লইয়া অনেক হাসি-তামাসাও করিয়াছে। কে জানিত যে এই ব্যক্তিই একদিন পরম নিশ্চিন্তভাবে তাহার স্বামীর পদ দখল করিয়া বসিবেন। প্রথমটা ব্রজদুলালের উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইল, সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মিল, এবং আজীন্দ্রের জন্য প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু এ ভাব বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ব্রজদুলাল তাহাকে ধরিয়াছিলেন মাকড়সার মত। তাহার বাহিরের আচরণে কোন পরিবর্ত্তন হইবার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার সরল হাস্য ও সজাগ সহানুভূতির সাহায্যে মাধুরীর অন্তরটাকে গলাইয়া আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। শেষে এমন হইল, ব্রজদুলাল না হইলে তাহার চলিত না! ব্রজদুলাল ছাড়া জীবনের সে কল্পনাই করিতে পারিত না।

আজীন্দ্রকে সে ভুলে নাই। সুন্দরকে ভোলা যায় না। তাহার স্মৃতি ভুক্তপূর্ব্ব মধুর গন্ধ, বর্ণ, বা সঙ্গীতের ধ্বনির ন্যায় এখনও তাহার

মনের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে থাকে। কিন্তু এ-স্মৃতি তাহার প্রতিদিবসকে বিস্বাদ করে নাই, তাহার তেল, নুন মশলায় বিতৃষ্ণা জন্মায় নাই, তাহার গার্হস্থ্যধর্ম্মে ব্যাঘাত ঘটায় নাই।

আজ যদি কোন যাদুকর ব্রজদুলালের স্থানে আজীন্দ্রকে বসাইতে চাহিত ত সে রাজী হইত না। কারামুক্ত আজীন্দ্রকে তাই সে সত্যই হাসিমুখে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। এ হাসির মধ্যে ছলনা ছিল না। আত্মগোপনের প্রয়োজন হয় নাই।

পনেরো

ব্রজদুলাল বলিয়াছিলেন, 'এই লোক ঘরে ঢুকলে আমি কি আর পাত্তা পাব?'—কথাটা এতই তুচ্ছ, যে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মতও নয়। দশ বৎসরের ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধকে এক কথায় মুছিয়া ফেলিবে এত গুণ আজীন্দ্র পাইবে কোথায়?

—আজীন্দ্রের 'রূপ' আছে, একথা অস্বীকার করিবে কে? তাহার মত 'পৌরুষ'ই বা আছে কয় জনের? কাঠগড়ায় বসিয়া ফাঁসির হুকুম প্রতীক্ষা করিল সে হাসির গান গাহিতে গাহিতে। এত বড় সবল মন! একি পথে-ঘাটে কুড়াইয়া পাওয়া যায় নাকি?—কিন্তু ইহাতে মাধুরীর কি? আকাশের চাঁদও ত বড় সুন্দর। তাই বলিয়া তাহাকে ধরিয়া নিজের আলমারীতে পূরিতে হইবে, এই বা কেমন কথা?

—কিন্তু ঐ চাঁদ দুষ্প্রাপ্য না হইয়া, যদি মাটিতে গড়াগড়ি যাইত! তাহা হইলে সে কি করিত? কুড়াইয়া লইত না কি? না। এই চাঁদকে স্থান দিবার জন্য একখানি দরকারী বাসনও যদি সরাইতে হইত, ত মাধুরী এ চাঁদকে ঘরে আনিত না।

—সবল পুরুষ না হইলে কি ভালবাসিতে জানে? আজীন্দ্র যখন কথা কহিত, তখন তাহার মুখ-চোখের ভিতর দিয়া হৃদয়ের আক্ষেপ যেন দেখিতে পাওয়া যাইত, এমন করিয়া প্রেমনিবেদন ব্রজদুলাল ত কখনও করেন নাই। মাধুরীর হর্ষ বা বিষাদের সকল খুঁটিনাটির দিকে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল সত্য, কিন্তু ইহাতেই কি মন ভরে? আবেগ নাই, উচ্ছ্বাস নাই, একটা ছলনা বুঝিবারও শক্তি নাই,—আছে শুধু একটা পরম নিশ্চিন্ত ভাব—একটা প্রাপ্তির নিশ্চিন্ততা। এমন অনেক সময় গিয়াছে, যখন ব্রজদুলালের নিজের রসিকতায় মাধুরী কপট কোপ প্রকাশ করাতে তিনি সত্য সত্যই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। মাধুরী যদি কোন দিন ছল করিয়া বলিয়াছে, 'আমার ভাল লাগে না, যাও!' অমনি তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন! পলাতক স্ত্রীকে শীকার করিয়া ধরিয়া আনিবে, বলে বশ করিবে, এ না হইলে পুরুষ? তা নয়, কেবল consideration, consideration. ছাই consideration!

—ছি, ছি, ছি! এমন কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল! এই consideration না থাকিলে সে বাঁচিত কিরূপে? মাধুরীর মনে পড়িল একবার রোগশয্যায় আঙুর বেদানা খাইয়া তাহার অরুচি হইয়াছিল। কিন্তু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তাহার স্বামী তাহার মনের কথা পড়িতে পারিয়াছিলেন, এবং কয়েকটা পীচ আনিয়া বালিসের পাশে রাখিয়া দিয়াছিলেন। এমনি প্রতি ছোট-খাট ঘটনায় সে তাঁহার অযাচিত স্নেহে সারা হইয়া যাইত। আজ এ-গুলিকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহে সে কোন্ মুখে? ছি, ছি! সকলকেই কি আজীন্দ্রের মত হইতে হইবে? সংসারে সকল

জিনিস কি মনের মত হয়? সে নিজেও ত বীণা রায়ের মত হাসিতে পারে না, লতিকা গুপ্তের মত গাহিতে পারে না। তাই বলিয়া নিজেকে ত সে কম ভালবাসে না।—

—আজীন্দ্রের কি সাহস! বোমা লইয়া খেলা করে! এদের সাহসের অন্ত নাই। খাঁ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল! নারীর সাধ্য আছে, এমন করিয়া হাত ধরিলে ছাড়াইয়া আসিতে পারে? কিন্তু সে ত,—ছাড়াইয়া আসিয়াছিল কি?—হাঁ, ছাড়াইয়াছিল ত,—হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

—নাঃ! আজীন্দ্রকে এতটা বাড়িতে দেওয়া ঠিক হয় নাই। কিন্তু সে করিবে কি? বন্ধুভাবে যে লোক বাড়ীর মধ্যে যাতায়াত করিতেছে, সে যদি একবার নিজেকে সামলাইতে না পারে, একটা দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়াই ফেলে, ত তখনি কি হাঁউ-মাউ করিয়া উঠিতে পারা যায়?—হাতখানা সে ধরিলই বা। ইহাতেই কি সে পতিত হইবে?

আজীন্দ্রের আলাপ করিবার ধারা এত বিশ্রী! কথা কহিবার সময় সে একেবারে ঝুঁকিয়া পড়ে, দুই হাঁটুর উপর দুই কনুই রাখিয়া এত কাছে মুখ লইয়া আসে যে গা শির্ শির্ করিতে থাকে। ইচ্ছা করে, দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া এই মুখখানাকে চুমায় চুমায় চুবাইয়া দিতে।—কিন্তু এমন কাজ ত সে করে নাই। নিজেকে সে বরাবর সংবরণ করিয়াছে, সতীধর্ম্মের কাছে আপনাকে বলি দিয়াছে। এত করিয়াও ত সে লোক-নিন্দা এড়াইতে পারিল না। তাহাকে লইয়া শ্লেষ-বিদ্রূপের অন্ত নাই। তাহার বিরুদ্ধে অকথ্য কথাও উঠিতেছে অনেক। সে চুপ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার মন জবাব দেয়, 'বেশ করেছি! আমার খুসী! পরপুরুষের সঙ্গে কথা কইবার অধিকারও নেই নাকি আমার?'

ঠিক এই জবাব সে নিজের স্বামীকে দিতে পারিত কি? কিন্তু স্বামী ত জবাব চান নাই। তিনি আভাসে ইঙ্গিতে অনেক-কিছু বলিয়াছেন বটে। কিন্তু সোজাসুজি কোন প্রশ্ন করেন নাই ত। দুঃখ পাইতেছেন, এমন কথাও ত বলেন নাই। হায় রে! দুঃখ ভোগ করিবার মত পুরুষত্ব যদি তাঁহার থাকিত!

—যাহাই করুক, সে স্বামীকে আঘাত দিতে চাহে না। তিনি আঘাত পাইয়াছেন জানিলে এখুনি আজীন্দ্রকে—ঠিক তাড়াইয়া দিতে পারিবে না, তবে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা কমাইয়া দিবে।—কি করিবে? অনেক দিনের পরিচয়। পুরাতন বন্ধুত্ব! একেবারে মুছিয়া ফেলা যায় কি?

—মুছিবে কি? তাহাকে একদণ্ডও যে ভুলিতে পারে না। তাহার উপবাসী মন অহর্নিশি আজীন্দ্রের প্রতীক্ষাতেই যে বসিয়া থাকে। এখন স্বামীর কাজে এক পা নড়িতে হইলে তাহার যেন তপোভঙ্গ হয়। স্বামীর সান্নিধ্য উচ্ছিষ্ট কদন্নের মত তাহার মনকে অশুচি করে। অথচ এই স্বামীকে সে কতই না ভালবাসিত!

—যাক্! সে কথা ভাবিতে নাই। সকল দিক এমন করিয়া ভাবিতে গেলে মানুষ বাঁচিতে পারে না। মাধুরী চোখ বুজিয়া helter-skelterএ নামিতে বসিয়াছে। এখন থামিবার চেষ্টা বৃথা, ফিরিবার চেষ্টা বৃথা। চেষ্টা করিতে গেলে পতনের আঘাতটাই লাগিবে বেশী করিয়া। এখন অতীত ভবিষ্যৎ ভুলিয়া নিজেকে ছাড়িয়া দেওয়াই একমাত্র কাজ। দুর্নিবার বেগে নীচের দিকে ছুটিয়া চলার উল্লাসই একমাত্র লাভ।—বুকের কাছে বড় খালি খালি বোধ হইতেছে!

মাধুরী প্রাণপণে আজীন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিল।

ক্ষীণ-ভুজবল্লরীর বাঁধন। কতটুকু বা শক্তি তার! আজীন্দ্র দুই

হাতে ইহাকে ছিন্নবিস্রস্ত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'তুমি মরগে যাও। আমি চল্লুম।'

হায়, নারী! হায়! জড় ধরিত্রীর চিন্ময় ক্রীড়নক! কর্ম্মক্লান্ত পুরুষের অবসরবিনোদন-বিলাস-সামগ্রী! ফুলের মত সে ছিঁড়িয়া তোলে। ফুলের মতই ছুঁড়িয়া ফেলে পথের ধূলায়। কিন্তু ফুলের মত তুই মরিতে পারিস্ কৈ? বেদনাস্ফুরিত হৃদয়ের রক্তে জীবনের প্রতিপল আর্দ্র করিয়া তোকে বাঁচিয়া থাকিতে হয় যে!

মাধুরীর রাগ হইল ব্রজদুলালের উপর। কাপুরুষ! সব দেখিয়াছে, বুঝিয়াছে,—অথচ স্ত্রীকে রক্ষা করে নাই। ধনীর সন্তান বলিয়া আজীন্দ্রকে কিছু বলিতে সাহস পায় নাই। ঐশ্বর্য্যের কাছে নিজের পত্নীকে সে বিক্রয় করিয়াছে!

ঠিক এই সময়ে ব্রজদুলাল আসিয়া বলিলেন, 'তাইত, বন্ধুটি গেলেন কোথায়? তাঁর সঙ্গে যে একটা কথা ছিল।'

মাধুরী চলিয়া যাইতেছিল। ব্রজদুলাল তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'আ রে! যাও কোথা? কথাটা তোমার জন্যও।'

অসহ্য ঘৃণায় মাধুরী হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

ষোলো

মাধুরীর বিশ্বাস ব্রজদুলাল এতদিন যে কথাটি বলিব বলিব করিয়া বলিতে পারেন নাই, এইবার তাহা বলিবেন। আজীন্দ্র যাতায়াত বন্ধ করিয়াছেন, সে যে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতেছে, সে খবরও হয়ত পাইয়াছেন। মনের সঞ্চিত বিষটা উদ্গার করিবার সময় আসিয়াছে এখন। তাই সেদিন তাঁহাদের দুইজনেরই অন্বেষণ করিতেছিলেন।

কিন্তু সেদিন কোন কথা শুনিবার শক্তি মাধুরীর ছিল না। তাই সে হাত ছাড়াইয়া চলিয়া আসিয়াছে। মাধুরীর এই ব্যবহারে দণ্ডের মাত্রা বাড়িবে বৈ কমিবে না। কিন্তু উপায় কি?

আশ্চর্য্য! ব্রজদুলাল কিছুই বলিলেন না। তিনি মনে মনে কি অস্ত্র শানাইতেছেন কে বলিতে পারে? স্বামীর এই মৌনভাবকে মাধুরী ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লইল, এবং উৎকর্ণ হইয়া দুর্দ্দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু এক এক করিয়া বহুদিন গেল। দুর্দ্দিন আসিল না। স্বামী একটু গম্ভীর হইয়াছেন মাত্র। তাঁহার ব্যবহারে আর কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। তাঁহার এই স্তব্ধতা মাধুরীর অসহ্য হইতে লাগিল। সে যতই চিন্তা করিতে লাগিল, ততই দেখিল সে সব কিছু সহ্য করিতে পারে—কেবল এটি ছাড়া। তিনি যদি ছোরাছুরি লইয়া মাতামাতি করিতেন সেও তাহার লাগিত ভাল। কিন্তু এই কিছু না বলার বিষ তাহাকে যেন পলে পলে শোষণ করিতে লাগিল।

স্বামী স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন না কেন? তিনি কি দয়া দেখাইতেছেন? তাঁহার কাছে সে ত দয়া ভিক্ষা করিতে যায় নাই।—এদিকে সংসারে ছোটখাট উপদ্রবের ত অন্ত নাই। এগুলি কি তাঁহার অজ্ঞাতে হইতেছে?

অবশেষে মাধুরীকেই একদিন কথা পাড়িতে হইল।

—'এমন টিপে টিপে মারা আমার ভাল লাগছে না। তুমি আমাকে কি বল্‌তে চাও স্পষ্ট ক'রে বল।'

ব্রজদুলাল গম্ভীরভাবে মাধুরীর মুখের দিকে একবার চাহিলেন। পরে হাসিয়া বলিলেন, 'সব কথা কি মুখ ফুটে বল্‌তে পারা যায়?'

মাধুরী। আমি কি অপরাধ করিছি বল। ব'লে দণ্ড দাও। আমি দণ্ড নিতে রাজী আছি। তোমার ক্ষমা আমি চাই না।

ব্রজ। দণ্ড-বিধিটা তোমাদের হাতে,—

'দেহি খর নয়নশরঘাতং।'

মাধুরী। ওসব বাঁকা কথা রাখ। আজীন-বাবুর বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিলেন। তুমি তাঁকে ঘরে ঢুক্‌তে দাওনি।

ব্রজ। না।

মাধুরী। কেন? আমি কি তোমার কয়েদী, যে কারুর সঙ্গে কথা কইতে পারবো না? কারুর সঙ্গে দু'দিন আলাপ কর্‌লেই তোমার—তোমার—প্রাণে আঘাত লাগ্‌বে?

ব্রজ। সাহস হয় না। একজনেতেই রক্ষে নেই। আবার আর একজন?

মাধুরী। কিন্তু এমনি ক'রে আমাকে আট্‌কাতে পার্‌বে না, ব'লে দিলুম। তিনি যে খবর দিতে এসেছিলেন, সে খবর আমি পেয়েছি।

ব্রজ। আজীন interned হয়েছে, খবর পেয়েছ?

মাধুরী। হ্যাঁ পেয়েছি। তুমি খবরটা চাপতে চেয়েছিলে।

ব্রজ। ঠিক বলেছ। খবরটা চাপতেই চেয়েছিলুম।

মাধুরী। কেন, জান্‌তে পারি?

ব্রজ। হিংসা, আর কি? একে আণ্ডামান, তার ওপর internment—অত্যন্ত দর বেড়ে যাচ্চে! সহ্য হয় না।

মাধুরী। তা' সত্যি! তোমার মত কাপুরুষের হিংসা হবারই কথা।

ব্রজদুলাল একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। তারপর আবার হাসিয়া বলিলেন, 'খবরটা পেলে কি ক'রে? অভিসারে গিছলে নাকি!'

মাধুরী। এখনও যাই নি। তবে দরকার হ'লে যাব।

ব্রজ। গিয়ে সুবিধে হবে না। বেচারা দরিদ্র। সেখানে গ্যাস্-ষ্টোভে চা হবে না, ভোর চারটায়।

মাধুরী। দেখ, আমাকে টাকার লোভ দেখিও না। তোমার টাকায় আমি পদাঘাত করি।

ব্রজ। তা' ত কর্‌চোই। ঐ পেটেণ্ট ষ্টোনের মেঝেটা ত আমার টাকাতেই তৈরী।

মাধুরী। টাকার নামে তোমার জিভে জল আসে জানি। তাই আজীন-বাবুর বেলায়—

মাধুরী কথাটা শেষ করিতে পারিল না।

মাধুরী চলিয়া যাইতে ব্রজদুলাল ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারী করিলেন, একবার হাসিলেন, একবার গোঁফে চাড়া দিবার জন্য হাত বাড়াইলেন, কিন্তু সূচাল ডগাটা খুঁজিয়া না পাইয়া হাত নামাইয়া ফেলিলেন।

সতেরো

যাক্! একটা নিষ্পত্তি হইয়া গেল। ব্রজদুলাল পরিষ্কার করিয়া কিছু না বলুন, মনের স্বরূপটি প্রকাশ করিয়াছেন, মাধুরী নিজেও যাহা বলিবার বলিয়াছে। এইখানেই শেষ করিলে হয় না? ইহার পর আর কি কথা আছে? আর ত কোন কথা থাকিতে পারে না।

দুইজনে একসঙ্গে বসবাস করিবে, প্রতিকাজে পরস্পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে,—স্বামীর হাত হইতে টাকা লইয়া সে বাজার করিতে দিবে, তাহার হাত হইতে জল খাইয়া স্বামীর তৃষ্ণা দূর হইবে;—অথচ কথা নাই! দুর্ব্বহ! দুর্ব্বহ!

স্বামীর সহিত এমন করিয়া সে কখনও কথা কহে নাই, এতগুলা কটুকথা বলিবারও প্রয়োজন হয় নাই, কখনও। ইহার পরেও বাঁচিয়া থাকিতে হইবে? এক ঘরে বাস করিতে হইবে? অসম্ভব!

সে রাত্রে মাধুরী সত্যসত্য জহর-ব্রত করিল আঁচলে আগুন লাগাইয়া। প্রেমে যাহা পারে নাই, এবার অপ্রেমে তাহা অনায়াসেই পারিল।

কাণ্ডটা করিল ছাদে গিয়া। ব্রজদুলাল বাড়ীতে ছিলেন না। ঘরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হইয়া কাণ্ডটা সারিতে পারিত। কিন্তু ভয় হইল অনেক-গুলি দামী দামী জিনিসে পাছে আগুন ধরিয়া যায়। স্বামীকে সে ভালবাসিত না। স্বামীর আত্মীয়বর্গকে সে বিষ নয়নে দেখিত, স্বামীর কোন জিনিসেও তাহার মমত্ব ছিল না। তবু এই ঘরের একটা আসবাবও সে নষ্ট করিতে পারিল না।

আঁচলখানা ধরিয়া উঠিতেই মাধুরী ভয় পাইল এবং সেটাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। আগুনের শিখা কিন্তু নিরস্ত হইল না। লোলজিহ্ব ক্ষ্যাপা কুকুরের মত সে মাটিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াই বাঁকিয়া ফিরিয়া আসিল, তাহার শাড়ীর প্রান্ত আক্রমণ করিল, এবং তাহার হাঁটু বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। মাধুরী চীৎকার করিল, ছুটিয়া পালাইবার চেষ্টা করিল,—আগুনটাও জ্বলিয়া উঠিল দ্বিগুণ বিক্রমে। এমন সময়ে কিসে পা আট্‌কাইয়া মাধুরী পড়িয়া গেল,—আর উঠিল না;– ভয়ে, আবল্যে,—কি সুবুদ্ধিবশে তাহা সেও বলিতে পারে না।—আগুন এখন মন্দীভূত তেজে জ্বলিতে লাগিল, তাহার বাম অঙ্গ দগ্ধ করিয়া।

ছাদ হইতে আগুনটা প্রথমেই চোখে পড়ে মহিমের। সে বায়স্কোপ দেখিয়া ফিরিতেছিল। বাড়ীর দিকে ছুটিয়া আসিতেই সে একটা

আর্ত্তনাদও শুনিতে পাইল। ব্রজদুলালের সদর দরজা খোলা ছিল। মহিম ভিতরে ঢুকিয়াই চীৎকার করিল,—'কিসে আগুন লেগেছে, আপনাদের ছাদে।' তারপর কোলাহল, হট্টগোলের অনুসরণ করিয়া নিজেই ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং অপটু লোকগুলাকে সরাইয়া দিয়া নিজেই আগুন নিবাইয়া দিল, দুই হাতের চাপে।

মাধুরীর সর্ব্বাঙ্গ ততক্ষণে মসীবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

একটা একঘেঁয়ে কাতর 'এ্যাঁঃ! এ্যাঁঃ!' শব্দের ফাঁকে মাধুরী বলিল, 'জল।'

একজন বিধবা পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। দাঁতে-দাঁত চাপিয়া বলিলেন, 'জল দোবো নিমতলার ঘাটে গিয়ে।'

মহিম শিহরিয়া উঠিল। মৃত্যুসময়েও ক্ষমা নাই! ইহারা মানবী না পিশাচী!

মানবীই হউক, পিশাচীই হউক, সেই ব্যক্তিই জল আনিয়া মাধুরীকে পান করাইল।

মহিমের দিকে ফিরিয়া মাধুরী বলিল, 'আমাকে হাঁসপাতালে নিয়ে চলুন।—এরা মেরে ফেলবে।'

ঠিক এই কথাটাই মহিমের মনে আসিয়াছিল। সে আর বিলম্ব করিল না। তখনই ট্যাক্সি ডাকিয়া মাধুরীকে হাঁসপাতালে লইয়া গেল। উক্ত পিশাচীকেও সে সঙ্গে লইল, কারণ তিনি ব্রজদুলালের ভগিনী, শান্তিলতা!

আঠারো

মাধুরী বলিল, 'আমার স্বামীকে ভালবাসি না। তাঁর হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যেই আত্মহত্যা করতে গেছ্লুম।'

—"চুপ! চুপ! এমন কথা বল্তে আছে? মিথ্যা বলুন, মিথ্যা বলুন। মাঝে মাঝে মিথ্যা কথা বল্তে হয়।"

মাধুরী তাহাই করিল। Accidentally পুড়িয়াছে বলিয়া ডাক্তারের কাছে রিপোর্ট দিল।

শান্তিলতা কিন্তু সত্য কারণটি শুনিয়াছিলেন। তাই মাধুরী হইতে যথাসম্ভব দূরে এক কোণে বিরক্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ব্রজদুলাল ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া একেবারে মাধুরীর কাছে গিয়া, তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

মাধুরী মুখ ফিরাইল।

ব্রজদুলাল দমিলেন না। তেমনি ঝুঁকিয়াই বলিলেন, 'কেন এমন কাজ কর্লে? আমাকে কিছু না ব'লে—'

মাধুরী মহিমের দিকে ফিরিয়া বলিল, 'এঁদের যেতে বলুন না।'

মহিম ব্রজদুলালের দিকে চাহিলেন। ব্রজদুলাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ডাক্তার আসিয়া দুইজনকেই বাহিরে যাইতে অনুরোধ করিলেন।

মহিমকে ব্রজদুলালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া যাইতে দেখিয়া মাধুরী বলিল,'আপনি চ'লে যাবেন না। আপনি আমাকে কোথাও নিয়ে যান।'

ব্রজদুলাল মহিমের হইয়া জবাব দিলেন, 'আচ্ছা, তাই হবে। উনিই নিয়ে যাবেন।'

বাহিরের বেঞ্চে ব্রজদুলাল বসিয়া আছেন। মহিম আসিয়া পার্শ্বে বসিল। মাধুরীর অনুযোগ এড়াইয়া সেও চলিয়া যাইতে পারে নাই।

পাশাপাশি দুইজনে বসিয়া রহিল। কাহারও মুখে কথা নাই।

অনেকক্ষণ পরে ব্রজদুলাল বলিলেন, 'বড় অত্যাচার করেছিলুম।'—

মহিম মনে মনে বলিল, 'সেটা বুঝ্‌তে পাচ্চি।'

ব্রজ। অনেকদিন ভাল ক'রে কথাবার্ত্তা কইনি।—

বলিতে বলিতে তিনি উঠিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'আমাকে তাঁর ভাল লাগ্‌চে না। আপনি একবার গিয়ে দেখুন না, যদি কিছু দরকার থাকে।'

মহিম। আমি আর কি করবো? আপনার ভগিনী ত রয়েছেন।

ব্রজদুলাল একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'যান না, মশাই, একবার। সে দেখ্‌লে আর আপনাকে বল্‌চি?'

মহিম দ্বিরুক্তি না করিয়া আদেশ পালন করিল।

উনিশ

মাধুরীকে কিছুদিন হাঁসপাতালে থাকিতে হইয়াছিল। ব্রজদুলাল প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে তাহাকে দেখিতে আসিতেন। মহিমও আসিত, নূতন কর্ত্তব্যের তাড়নায়। তাঁহারা কিছুক্ষণ বসিয়া বসিয়া চলিয়া যাইতেন। মাধুরী বিশেষ কোন কথা কহিত না। স্বামীর সহিতও না, মহিমের সহিতও না।

প্রথমটা যেরূপ মনে হইয়াছিল, ততটা ক্ষতি হয় নাই। ডানদিক চাপিয়া শুইয়া পড়াতে সে দিকটা রক্ষা পাইয়াছিল। পুড়িয়াছিল কেবল বাঁ-দিকের স্থানে স্থানে। চিকিৎসার গুণে সমস্তই নির্দ্দোষভাবে সারিয়া গেল। কেবল বামগণ্ডের উপরকার ক্ষতটা আজিও সারে নাই। সেও চিকিৎসার গুণে। একটু অতিচেষ্টা করা হইয়াছিল, গালের চামড়াটা বাঁচাইতে। ফলে বাঁচিয়া গেল ক্ষতটা। গালে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া, মাধুরী এখন চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে। তাহার প্রতি মহিমের যদি কিছু কর্ত্তব্য থাকে ত তাহা পালন করিবার সময় এই।

মহিম বড় সমস্যায় পড়িল। অতি কাতরভাবেই মাধুরী তাহার আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিল। ইহা কি ক্ষণিকের মোহে? না, ইহাই তাহার প্রাণের কথা?—প্রাণের কথা না হইবার ত কোন কারণ নাই; যে গৃহের দুঃখ অগ্নিদাহের জ্বালাকে ম্লান করিয়া দেয় সে কি গৃহ? সেই গৃহে সে ফিরিবে কেমন করিয়া? অথচ মহিমই বা তাহাকে আশ্রয় দিবে কিরূপে? সে বিবাহ করে নাই। কয়েকজন পোষ্য-পরিবৃত হইয়া বাস করে। ইহার মধ্যে সে পরের স্ত্রীকে স্থান দিবেই বা কোথায়, পরিচর্য্যাই বা করিবে কিরূপে? তবে সে ফিরিয়া যাক্ পতিগৃহের অগ্নিকুণ্ডে?—কিন্তু ব্রজদুলালকে ত খুব ভয়ানক বলিয়া মনে হয় না। বরং তাহার আচরণে একটু স্নেহের ভাবই বেশী করিয়া চোখে পড়ে। ইহার অনেকটা হয়ত লোক-দেখান। স্ত্রী আত্মহত্যায় অকৃতকার্য্য হইয়া যেদিন ঘরে ফিরিবে, সেদিন এরূপ থাকিবে কি? তিনি কথায় কথায় চটিয়া আগুন হন, তাহার পরিচয় মহিম নিজেই ত পাইয়াছে।

দুর্ঘটনাটা ঘটিয়াছে আজীন্দ্রের কলিকাতা ত্যাগের কিছু পরেই।

আজীন্দ্রের সহিত মাধুরীর ঘনিষ্ঠতাই হয়ত ইহার মূল। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ত ক্ষমা নাই। ব্রজদুলাল ক্ষমা করিতে পারেন এ-বিশ্বাস থাকিলে মাধুরী আজও তাঁহার কাছে নির্ব্বাক্ হইয়া থাকে?

ঘরের মধ্যে ত শুধু ব্রজদুলাল ন'ন, শান্তিলতাও আছেন। শান্তিলতাকে সে নিজের চক্ষে দেখিয়াছে। এই পিশাচীর মুখে অনাথাকে নিক্ষেপ করিয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা করা,—এতবড় অমানুষের কাজও ত আর কিছু হইতে পারে না।

স্বামী স্ত্রীতে ত রক্তারক্তি করিতেছে জগৎ জুড়িয়া। সকল ঘরোয়া বিবাদের মধ্যেই কি মহিম মধ্যস্থতা করিতে যাইবে? এই বা কেমন কথা? সকল দুঃখ কি সে দূর করিতে পারে? সকল স্ত্রীকে কি সে বাঁচাইতে পারিবে?—কিন্তু সকল স্ত্রী ত তাহার আশ্রয় চায় নাই। সকল স্ত্রীর দুঃখ ত সে নিজের চোখে দেখে নাই।

আরও—মাধুরী ত শুধু ব্রজদুলালের স্ত্রী নয়। সে যে আজীন্দ্রের প্রিয়তমা।

আজীন্দ্রের যুবতী প্রিয়তমাকে লইয়া সে একটা আলাদা বাসা ভাড়া করিবে—সেই বা কেমন কথা! কিন্তু আজীন্দ্রের প্রিয়তমা বলিয়াই এ কাজটা সম্ভব। নিজের মনে কোন লোভ থাকিলে কাজটা অন্যায় হইত বটে। কিন্তু লোকে ত তাহা বুঝিবে না। তাহারা ইহার মধ্য হইতে অনেক কদর্থ টানিয়া বাহির করিবে। Hang it!

সসঙ্কোচে মহিম কথাটা পাড়িল, 'আপনি সেদিন আমাকে বলেছিলেন কোথাও নিয়ে যেতে!'

মাধুরী। অবশ্য আপনার যদি অসুবিধা হয়—

মহিম। না, না, আমার অসুবিধা নয়। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌চি,

আপনার কোন অসুবিধা হবে কি না? আপনি হয়ত স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চান।

মাধুরী। আবার এই কালামুখ নিয়ে? না।—কোথাও স্থান না পাই রাস্তায় প'ড়ে থাকবো।

কথাটা বলিবার সময় সে ভাবিয়া চিন্তিয়া বলে নাই। তবে বলিয়াই সে ভাবিল, ঠিকই বলিয়াছে।

মহিম। না, রাস্তায় থাকবেন কেন?—

তারপর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'আজীন আমার বড় অন্তরঙ্গ বন্ধু।'

মাধুরী তাহা জানিত। আজীন্দ্রের উপর দাবীর জোরেই সে মহিমকে আশ্রয় করিল,—যদিও সে মনে মনে সে আজীন্দ্রের সহিত সকল সম্পর্ক ঘুচাইয়া দিয়াছে। মহিমও তাহাকে আশ্রয় দিল আজীন্দ্রের সহিত বন্ধুত্বের জোরে—যদিও এ কথাটা সে আজীন্দ্রকে জানায় নাই। অবশ্য, তাহার একটা কারণ, সে তখন অন্তরীণে।

কুঁড়ি

সন্ধ্যার সময় মাধুরীকে দেখিতে আসিয়া ব্রজদুলাল শুনিলেন, সে নিজেই risk bond sign করিয়া চলিয়া গিয়াছে, with her brother.

'That's all right' বলিয়া তিনি নাচে নামিয়া গেলেন।

গেটের কাছে আসিয়া ব্রজদুলাল কি একটা ভাবিলেন। একবার হাসিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিবার জন্য ঝুঁকিলেন। তারপর ছড়িটা ঘুরাইয়া ঠিক উল্টাদিকে চলিয়া গেলেন।

বিশ্বের বাজে কাজ সারিয়া বেশ রাত্রি করিয়াই ব্রজদুলাল বাড়ী

ফিরিলেন। বাড়ী ফিরিয়া আর নিজেকে সাম্‌লাইতে পারিলেন না। দুড়্ দুড়্ করিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতেই হাঁকিলেন, 'আবার আপদ হাজির হ'ল, মাধুরী।' এক ডাকে সে উত্তর দিবে ভাবেন নাই। তাই আবার ডাকিলেন, 'মাধুরী।'

শান্তিলতা ছুটিয়া আসিল।

'কাকে ডাকৃচো, দাদা? বৌদিদি কোথায়?'

ব্রজ। আসেনি এখনো? তারা ত বেরিয়েছে অনেকক্ষণ!

শান্তি। তারা কারা?

ব্রজ। এই যে মহিমের সঙ্গে এসেছে শুন্‌লুম।

শান্তি। হা পোড়া কপাল! মহিমের সঙ্গে বেরিয়েছে সে তোমার কাছে আস্‌বার জন্য?

ব্রজ। কি বল্‌চিস্ তুই? বাড়ীতে আস্‌বে না ত যাবে কোথায়?

শান্তি। যাবে কোথায়? এতক্ষণে ঐ মহিমের পাশে ব'সে সোহাগ কর্‌চে, দেখগে যাও।

ব্রজ। তোর আজকে হয়েছে কি, বল্ দিকি? যা' মুখে আসে বলিস্ যে!

শান্তি। তোমার মাধুরীকে তুমি চেননি, আজও। কিন্তু আমি যে নিজের কানে শুনেছি। 'স্বামীকে দেখ্‌তে পারি না তাই পুড়ে মর্‌তে গিছ্‌লুম।' এ কথা সে নিজে বলেছে।

ব্রজ। এমন পাগলও দেখিনি কোথাও! স্বামীকে যে দেখ্‌তে পারে না, সে কি আত্মহত্যা করে? স্বামীকে ভালবাস্‌লেই কথায় কথায় অভিমান হয়, আত্মহত্যার দরকার হয়,—এটা বুঝিস্ না?

শান্তি। তাই বুঝি মহিমের সঙ্গে চ'লে যেতে চাইল সেদিন? তোমার সাম্‌নেই ত বল্‌লে।

ব্রজ। বল্‌লে, তাতে কি?

শান্তি। তুমি অন্ধ, না বোকা? তোমার ঐ আত্মীন ছোঁড়াটার সঙ্গে—

ব্রজ। ছোঁড়াটার সঙ্গে কি?—এঁ্যা—ছোঁড়াটার সঙ্গে কি, বল্‌।

শান্তি। তুমি যেন দেখনি কিছু।

ব্রজ। আঃ! তুই একটু থাম্‌ দিকি।

শান্তি। তোমার কথাবার্ত্তা শুনে ত মনে হ'ত সব বোঝ।

ব্রজ। বুঝব কি, শুনি? সে আমাকে ছেড়ে চ'লে যাবে, এ কথা কি স্বপ্নেও ভেবেছি, যে বুঝবো?

শান্তি। ছেড়ে সে অনেক দিনই গেছে। তোমার মুখ দেখলে তার গায়ে জ্বর আস্‌তো। তুমি টের পাওনি। আমরা পেয়েছিলুম।

ব্রজ। তুই ঠিকই বলিচিস্‌রে। সে আর ফিরে আস্‌বে না। এই রোজ তার সঙ্গে দেখা করিচি। একটা কথা পর্য্যন্ত কয়নি, জানিস্‌? আমি শুইগে যাই।

শান্তি। কিছু খেয়ে নিয়ে শোও গে যাও।

ব্রজ। আমার ক্ষিধে নেই।

শান্তি শুনিল না। একটা রেকাবীতে কিছু খাবার লইয়া তাঁহার মুখের সাম্‌নে ধরিল। তিনি বিছানায় বসিয়াই গপ্‌ গপ্‌ করিয়া সেগুলা গিলিয়া ফেলিলেন।

শান্তি বলিল, আর কিছু আনি?'

ব্রজ। বল্‌চি, আমার ক্ষিধে নেই। তুই কিছুতেই শুন্‌বিনি।

শান্তি। একটু বোসো, দাদা। মশারীটা ফেলে দিই।

ব্রজ। মশারী ফেল্‌তে হবে না, যা।

শান্তি। ফেল্‌তে হবে বৈ কি। বড্ড মশা!

ব্রজ। ফ্যাল্ দিকি তুই। টান মেরে যদি না ছিঁড়ে ফেলে দিই!

ধাঁ ধাঁ করিয়া পাখার বাতাস করিয়া শান্তি মশারী ফেলিয়া দিল। ব্রজদুলাল পা গুটাইয়া লইলেন।

শান্তি। তুমি একটা বিয়ে কর, দাদা। এমন ক'রে চল্‌বে না।

ব্রজ। হিঃ! তাই বটে! দশ বৎসর বুকে বুকে ক'রে রেখে মন পেলুম না। আর একটা নতুন লোককে ধ'রে এনেই পোষ মানাব! তুই বলিস্ কি রে? এঁ্যা? কি রে তোরা?

শান্তি আর কথা বাড়াইল না।

বাতিটা জ্বলিতে লাগিল। ব্রজদুলালই সেটা নিবাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িবেন।

বিছানাটা মস্ত বড় বলিয়া মনে হইতেছে। কোন্ জায়গাটিতে শুইবেন ঠিক করিতে না পারিয়া ব্রজদুলাল বসিয়া রহিলেন।

বারোটা বাজিল, এইবারে শুইবেন।

ঘরের প্রত্যেক ছোট খাট জিনিস আজ নূতন করিয়া তাঁহার চোখে পড়িতে লাগিল। ঐ আইভরির কাজ করা আবলুশের বাক্সটায় মাধুরী তাঁহার পুরাণ চিঠিপত্রগুলা রাখিয়াছিল। নিজের রচনায় নিজে তিনি লজ্জিত হইয়া উঠিতেন। অনেকবার এগুলা ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মাধুরী কিছুতেই ফেলিতে দেয় নাই। আজ ঐ বাক্সটিতে কি আছে কে জানে?

টেবিলের উপরে জাপানী ফ্রেমে, কাল সিল্কের উপরে জল্‌জলে সাদা অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—'Love and Sacrifice'. সিল্কের সূতা দিয়া মাধুরী নিজে এটা লিখিয়াছিল।—ছেলেমানুষী খেয়াল!

দুইটা বাজিল। এইবারে শুইবেন।

সাম্‌নের দেয়ালে মাধুরীর একখানা bromide enlargement ছিল। নব-পরিণীতার অর্থহীন শূন্য দৃষ্টি। এই দৃষ্টির পশ্চাতে এতটা দুষ্টামী ছিল? না, না, না, না। ব্রজদুলাল ভুল করিয়াছেন। হয়ত কোন বিপদ হইয়া থাকিবে। তাঁহার ইচ্ছা হইল তখনই মহিমের নিকট ছুটিয়া যান। কিন্তু অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে।

কোন বিপদ ঘটিয়াছে, নিশ্চয়। তাই আসিতে পারে নাই। ঐ যে একখানা গাড়ী এই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে না? হাঁ, ঠিক্ ত। বাড়ীর দুয়ারে একেবারে,—নাঃ! থামিল না ত! আর একখানা গাড়ী আসিতেছে। বড় জোরে ছুটিয়া আসিতেছে। মাঝ-পথে থামিয়া গেল কেন? কি হইল? ঘোড়া ক্ষেপিয়া গাড়ী ভাঙিয়া দিল? না। গাড়ীটা ফিরিয়া যাইতেছে।

চারটা বাজিল। এইবার শুইয়া পড়িবেন। আর নয়।

শুইতে গিয়া দেখিলেন তাঁহার কানবালিশটা ঠিকস্থানে নাই। তাঁহার মনে পড়িল মাধুরী গিয়া অবধি এই বালিশটা তিনি দেখিতে পান নাই। এই সংসারের মধ্যে তাঁর কানবালিশটার খবর রাখিতে পারে শুধু একজন। সেই লোকটিই তাঁর একমাত্র পর?

ব্রজদুলাল শুইতে পারিলেন না।

পাঁচটা বাজিল। এইবার,—না। আর শুইবেন না। এখনই মহিমের কাছে গিয়া সন্ধান লইবেন।

শান্তি বলিল, 'আমাকে সঙ্গে নাও, দাদা। তা না হ'লে তার দেখা পাবে না।'

ব্রজ। না, তোকে নিয়ে যাব না। তুই তাকে দুচক্ষে দেখতে পারিস্ না।

মহিম কালীঘাটে একটা ব্লক ভাড়া করিয়াছে শুনিয়া তিনি ট্যাক্সি লইয়া সেইদিকে ছুটিলেন।

মহিমের সহিত দেখা হইবামাত্র বলিলেন, 'মাধুরী বাড়ী যায়নি যে?'

মহিম। মাফ কর্‌বেন,—তিনি আপনার বাড়ী যেতে চান না।

ব্রজ। যেতে চান না মানে? বাড়ী যেতে চান না? এইখানেই থাকবেন না কি?

মহিম। হাঁ, আপাততঃ এইখানেই থাকবেন।

ব্রজ। না, না! আপনি বলুন আমি এসেছি। আমি তাঁকে নিয়ে যেতে এসেছি।

মহিম ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'না, তিনি আস্‌বেন না।'

ব্রজদুলাল তাঁর আকাশফাটা গলায় বেশ চীৎকার করিয়াই বলিলেন, 'আর আস্‌বো না, কিন্তু তাঁকে বল্‌বেন, আমি চ'লে যাচ্ছি। আর আস্‌তে পার্‌বো না।'

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু ভিতর হইতে কোন কাতর আবেদন আসিয়া পৌঁছিল না।

কাজেই তিনি হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

কিছুদূর গিয়াই ফিরিয়া আসিলেন। মহিমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মত বদ্‌লালো না?'

মহিম। আজ্ঞে—না।

ব্রজ। বলেন কি, মশাই। একলা ফিরে যাব? সে কি রকম হবে?

মহিম। আমাকে মাফ কর্‌বেন—

ব্রজ। কেমন কেমন বোধ হচ্ছে যেন, না?

একবার হাসিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু গোঁফের নীচের দুরন্ত

শিশুটা আজ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে আর ঠোঁটের ফাঁকে উঁকি মারিল না।

ব্রজদুলাল ফিরিয়া গেলেন। এবারেও ছড়ি ঘুরাইয়া, বেশ সহজ-ভাবে পা ফেলিয়া চলিলেন।

অতি প্রত্যুষে তাঁহাকে বাহির হইতে হইয়াছে। •পমেটম দিয়া চুলগুলি আঁটিয়া দিবার সময় হয় নাই। সেগুলা বাতাসে উড়িতেছে। দুই হাতে চাপিয়া যথাস্থানে বসাইয়া দিবার কথা মনে নাই।

ব্রজদুলালের মাথায় এত লম্বা চুল ছিল কে জানে? এই চুল দিয়া তিনি টাক ঢাকিয়া রাখিতেন? লোকটা যে এত কদাকার তাহাই বা কে জানিত?

ঘরের ভিতর হইতে মাধুরী ব্রজদুলালকে দেখিয়াছিল। ব্রজ-দুলালের সহিত তাহার অতি নিকটতম পরিচয় ছিল। তাঁহার মুখের প্রতিরেখা সে নিবিষ্ট-চিত্তে পাঠ করিয়াছে দশ বৎসরকাল! কিন্তু আজিকার ব্রজদুলালকে ত সে চিনে না। তাঁহার মুখে আজ কি ছিল? হিংসা, না বিষাদ? মাধুরী ঠিক বুঝিতে পারিল না। কিন্তু তাহার প্রাণের ভিতর হু হু করিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, যাহা হইবার হউক, তখনি ফিরিয়া যায়! কিন্তু পারিল না। এত কাণ্ডের পর! সে যে বড় বিশ্রী দেখাইবে। লোকে বলিবে কি! শান্তিলতা যে হাসিবে! সে যে পোড়ামুখ আরও বেশী করিয়া পুড়াইয়া দিবে!

যে সঙ্কোচের বশে সন্দীপের সীতা রাবণের অঙ্কশায়িনী হইতে পারেন নাই, ঠিক সেই সঙ্কোচেই অভাগিনী পতিগৃহে ফিরিতে পারিল না।

একুশ

মহিমের যৌবনে নারীর সংস্পর্শ এই প্রথম। কখনও যাহাকে একখানা সাড়ী কিনিতে হয় নাই, সেই একটা গৃহস্থালীর সম্পূর্ণ আয়োজন করিয়াছে, তিন দিনে। ইহার মধ্যে অভাব, অসঙ্গতি ত থাকিবেই,—আবশ্যকের বদলে প্রাচুর্য্য, পটুতার স্থানে নিষ্ঠা।

মাধুরীর দয়া হইত। মাঝে মাঝে হাসি পাইত। কিন্তু সবটা ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল একটা বিরক্তির ভাব, যাহাকে সে কিছুতেই দাবাইতে পারিত না।

সে বরাবর সুখে লালিত হইয়াছে। কবিত্ব করিয়াও দারিদ্র্যকে সে মধুর করিতে পারিত না। এই রঙীন পল্‌কা আসবাবে ঠাসা ছোট ঘর তাহার মনকে যেন চাপিয়া ধরিত। তাড়াতাড়িতে কেনা নেটের মশারীটার ঝুল এত কম যে বসিলে চাল মাথায় ঠেকে, টেবিলটা ছুঁইবা-মাত্র ঘট ঘট করে, আয়নাখানা কথায় কথায় মুখ ফিরায়,—মাধুরীর যেন কান্না আসিতে থাকে। ফুল, পাতা, লতা আঁকা সোনালী, রূপালী টয়লেট্, সরঞ্জাম আছে অনেক কিছু। কেবল এমন একখানা চিরুণী নাই, যাহাতে সে চুল আঁচড়াইতে পারে। মহিম সাড়ী ও শেমিজে দেরাজ ভরিয়াছে। কিন্তু শেমিজগুলা কিনিয়াছে, নিজের মাপে। মাধুরীর চেয়ে তারা বিঘত খানেক বড়। অথচ, সমস্ত বাড়ী হাৎড়াইয়া একটা কাঁচি বা ছুঁচ সূতা মিলিবার উপায় নাই।

সে দাঁত মাজে Euthymol আর soft brushএ, মহিম জোগাড় করিয়াছে Kolynos আর hard brush. এইটা ব্যবহার করিয়া তাহার মুখে ঘা হইয়া গিয়াছে। তাহার চা খাওয়া অভ্যাস। রোজ ভোরে তাহার স্বামী নিজে জল গরম করিয়া তাহাকে ডাকিয়া

তুলিতেন। মহিম চা খায় না, চায়ের কোন বন্দোবস্ত করেও নাই। মাধুরী চা খায় কি না একবার জিজ্ঞাসাও করে নাই। এদিকে মাধুরীও বলিতে পারে না, 'ওগো আমার জন্য তুমি চা আনাও। Euthymol আনাও।'

মহিমের চেষ্টার ক্রটি নাই। বিদেশীয় পাড়াগেঁয়ে চাকরের মতই সে কুব্জদেহে, করজোড়ে অনুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছে আদেশ পালনের জন্য। কিন্তু একটা ইসারা সে করিতে পারে না, একটা কথাও সে বুঝিতে পারে না, একটা কাজও সে সুন্দর করিয়া করিতে পারে না।—দেশলাই আনিতে ফুলদানী উল্টাইয়া ফেলে, দুধের বাটি হাতে করিয়া নিজেই উল্টাইয়া যায়!—মাধুরীর রাগ হইতে থাকে।

যেখানে কৃতজ্ঞায় মন ভরিয়া যাওয়া উচিত ছিল, সেখানে রাগ হয়, ইহাতে মাধুরীর আত্মগ্লানির অভাব ছিল না। বিমুখ চিত্তকে ঘাড় ধরিয়া সে বার বার মহিমের পদে নত করিতে চায়। বার বার সে বাঁকিয়া বসে।

মহিমের দান যতই সে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারে না, ততই তাহার আগ্রহ হয় প্রতিদানের জন্য। কিন্তু প্রতিদান করিবে কি দিয়া? তাহার সম্বলের মধ্যে ছিল রূপ। তাহাও ত অনেকটা নষ্ট হইয়াছে।

তবু যাহা আছে, তাহাই কি এত তুচ্ছ! দর্পণের সম্মুখে বসিয়া বার বার সে নিজের রূপের দিকে চাহিয়া দেখে। কৈ, কিছু নষ্ট হয় নাই ত। গালের ক্ষতটা চাপিয়া রাখিলে, যাহা থাকে, তাহাও অমূল্য। সেই তুলি দিয়া টানা ভ্রূ, দীর্ঘপক্ষ্ম নয়নপল্লব, নিটোল মুখ,—কৈ, ইহাদের ত কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। গ্রীবার ডৌল আজিও অটুট রহিয়াছে। ভাস্করের আদর্শস্থানীয় ডানহাতখানিতে এখনও

চিত্তলোভন লালিত্য। মাধুরী মহিমকে ধন্য করিয়া দিতে চাহিল, এই রূপের ছিটা-ফোঁটায়,—একটু স্পর্শ, একটু হাসি, একটু সরস চাহনি।—প্রেম নাই, তাই প্রেমের অভিনয়, সহৃদয়তা নাই, তাই বখ্‌শিসের বহ্বাড়ম্বর!

এমন সরল হাসি ও বাঁকা কটাক্ষ কিন্তু মহিমকে স্পর্শই করে না। কটাক্ষ দেখিলেই সে পলাইতে চায়। তাহার মনে হয়, সে ভুল বুঝিতেছে। নিজের মনে পাপ ঢুকিয়াছে বলিয়া সোজা চাহনিতে কটাক্ষ দেখিতেছে। আজীন্দ্রের মাধুরী তাহাকে কটাক্ষ করিবে কেন?

মহিমের এইরূপ দুর্ভেদ্য বর্ব্বরতায় মাধুরীর বিরক্তি বাড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে একটা স্বস্তির নিশ্বাসও ছাড়িল। ঐ লোক কাছে ঘেঁসিয়া আসিলে যে একেবারে দুঃসহ হইয়া উঠিত! বিসদৃশ টানা পাখাটি ঘর জুড়িয়া অহর্নিশি নড়িতেছে তাহারই সেবায়। নড়ুক। যথাসম্ভব দূরে দূরে থাকিয়া নড়ুক। কাছে আসিয়া পড়িলে একেবারে দম বন্ধ হইয়া যাইবে।

পাখা নড়িতে লাগিল।

পরম বিতৃষ্ণায় এইটার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে কখন মাধুরী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; এবং তাহার মুখের বিরূপতা মুছিয়া গিয়া কখন একটি হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে!

ধাউস পাখাটা তখনও নড়িতেছে,—লেপের পর লেপ,—শান্তির তুলি বুলাইয়া।

বাইশ

ক্ষত সারিল। রহিল একটা scar,—অচল টাকার টাঁকশালের দাগ। ক্ষত ঢাকিয়া রাখিতে হয়। Scar ঢাকা দেওয়া যায় না। Scar ঢাকিলেও মুখের অসামঞ্জস্য ঢাকিবে কি দিয়া? দীর্ঘপক্ষ্ম নয়নপল্লবে যে টান পড়িয়াছে, পাশের দিক হইতে! এখন মুখের ডান দিক হাসিলে, বাঁ দিকটা কাঁদিতে থাকে!—নিজের রূপ দেখিয়া মাধুরী আঁৎকাইয়া উঠিল।

রূপের গর্ব্বস্ফীত বেলুনের উপর হইতে সে মহিমকে খুব ছোট করিয়া দেখিয়াছিল। বেলুনটা ফাঁসিয়া গিয়া আজ সে মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছে। আজ আর মহিমের নাগাল পাওয়া যায় না, সে এতই বড়!

মহিম তাহার জন্য কি না করিয়াছে? প্রাণ দিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে। একজন কুরূপা পরস্ত্রীর জন্য সে আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়াছে, সমাজ-শাসন বরণ করিয়াছে, অপ্রীতি ও অযশ কুড়াইয়াছে, নিজের ভবিষ্যৎকে নষ্ট করিয়াছে,—দুঃখের গোবর্দ্ধনকে নিজের হাতে ধরিয়াছে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য। মাধুরীর রূপের দিকে সে তাকাইল না, কুরূপের দিকেও তাকাইল না। দেবতার মত বেল ও তুলসীতে তার সমান আদর, সমান অনাদর! ছি, ছি! অর্ঘ্যের সাত্বিকতা দিয়া যাহাকে পূজা করিতে হয়, তাহাকে সে বশ করিতে চাহিয়াছিল, সুন্দরের ডালি পাঠাইয়া?

এতদিন পরে, আজ মাধুরীর মন সত্য সত্যই কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। এত দিন পরে, আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল, মহিমের প্রতি ভ্রূবিলাস খাটে না। সে যে আজীন্দ্রের বন্ধু! হৃদয়ের সম্বন্ধে সে যে

দেবর!—অস্ত্র নাই, মৃগয়ার প্রয়াসও নাই; রহিল কেবল স্বত-উৎসারিত সেবা।

কটাক্ষের ধনুষ্টঙ্কারে যে পলাইতে চাহিয়াছিল, সেবার ফাঁসজল তাহাকেই আকর্ষণ করিতে লাগিল। এখন মাধুরীর সঙ্গ-কামনায় মহিম সতৃষ্ণ হইয়া থাকে। প্রত্যহ কর্ম্মস্থল হইতে আসিবার সময় মনে হয়, আজ হয়ত মাধুরী গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত আছে, তাহার সহিত দেখা হইবে না; আজ হয়ত তাহার শরীর ভাল নাই, সে কথা কহিতে চাহিবে না,—এইরূপ কত দুশ্চিন্তা!—ডাক্তার মাধুরীর মুখে operation করিতে চাহিয়াছেন। Operationএর পর কতদিন সে শয্যাশায়ী থাকিবে কে জানে? কতদিন হয়ত হাসিতে পারিবে না।—যদি কোন বিপদ ঘটে! Chloroformএর নেশা যদি না কাটে! যদি আর জ্ঞান না হয়! এত চিন্তা কি আজীন্দ্রের মাধুরীর জন্য?—

নিশ্চয়। একটা লোক মরিয়া যাইতে পারে ভাবিলে কাহার না চিন্তা হয়?

আজীন্দ্রকে মাঝে রাখিয়া তাহারা দুই জনে 'চোর চোর' খেলিতে লাগিল। একজন ছুটিয়া যায় ধরিবার জন্য, আর একজন ছুটে ধরা দিবার জন্য, কছাকাছি হইলেই 'বুড়ি' ছুঁইয়া দেয়।

শেষে একদিন খেলার নেশায় ছুটিতে ছুটিতে, 'বুড়ি'টা ধূলিশায়ী করিয়া তাহারা একেবারে পরস্পরের বুকের উপর আসিয়া পড়িল। তারপর যখন চৈতন্য হইল, দেখিল, তাহাদের মধ্যে আর এতটুকু ব্যবধান নাই যেখানে আজীন্দ্রের স্থান হইতে পারে।

তীর-ধনু ছাড়িয়া, শিশু কিউপিড্ এবার নিজে নামিয়া আসিলেন;—ছোট দুখানি অপটু চরণের নৃত্য-চাপল্যে টল্‌মল্ করিতে করিতে অনিয়ত হাস্যের দিগ্‌ভ্রান্ত আবেগে ছুটিয়া, ছিট্‌কাইয়া, ঝাঁপাইয়া

পড়িলেন মাধুরীর বুক হইতে মহিমের কোলে এবং কুসুমপেলব দু'টি হাতের মুঠায় দুইজনের হৃদয় টানিয়া এক করিয়া দিলেন।

তিন বৎসরের ইতিহাস। মাধুরীর শুষ্ক জীবনোদ্যানে নূতন করিয়া পাতা গজাইল, ফুল ফুটিল, ফল ধরিল। যে গুটিপোকাটি তাহার বিরাট ক্ষুধা লইয়া এসমস্ত এক দণ্ডে শ্রীহীন করিয়া দিতে পারিত, সে এখন নিজের বোনা সুতার জালে আটক পড়িয়াছে,—জেলে। সে এখন একেবারেই হিসাবের বাহিরে।

তেইশ

নির্ব্বাসিত আজীন্দ্রের জন্য সংসার বসিয়া রহিল না। কর্ম্মচক্র পূর্ব্বের মতই চলিতে লাগিল—

'ঘোড়ার তাহার জুটিল সওয়ার, ইয়ার পাইল সাকী।' কেবল অভাব মিটিল না একজনের। তিনি আজীন্দ্রের পিতা। বুড়া বড় তাড়াতাড়ি অথর্ব্ব হইয়া পড়িলেন। কোন রোগ নাই, কেবল শীতের স্পর্শে অশ্বত্থ তরুর মত আপনাআপনি শুকাইয়া গেলেন। লোকে অবাক্ হইয়া বলিতে লাগিল, 'তাইত! বুড়া ছেলেকে এত ভালবাসিত!' ফুল যে ভ্রমরকে ভালবাসে, একথা সকলেই জানে। এই ভালবাসার প্রকাশ আছে বর্ণে, গন্ধে, মধুস্রাবে। কিন্তু ফুল যে ফলকে ভালবাসে একথা জানে শুধু তার উন্মুখ মধ্যকেশরটি।

রাজেন্দ্র আজকাল প্রায়ই বাড়ীতে থাকেন না। যদি কখনো আসেন, একবার দেখা দিয়াই চলিয়া যান। বাড়ীর ঝোলভাতে তাঁহার অরুচি হইয়াছে কি না, জানা নাই। তবে ঝোলভাত মুখে করিবার অবসর কোথায়? যে সুখের মধ্যে তিনি ডুবিতে চান

তাহাতে গভীরতা বড় কম বলিয়াই বেশীক্ষণ পড়িয়া থাকিতে হয়। আপাতত যাহা বিস্বাদ মনে হইতেছে, মুখে করিয়া রাখিতে রাখিতে তাহা হইতে কিছু রস পাওয়া যাইবে, এই আশায় তিনি পড়িয়া আছেন।

এদিকে সমরেন্দ্রের অবস্থা ইদানীং বেশ খারাপ বলিয়াই মনে হইতেছে। তৃপ্তির ভয় হইল, বৃদ্ধ মৃত্যুসময়ে হয়ত কোন পুত্রকেই দেখিতে পাইবেন না। সে নিজেই তখন দরখাস্ত করাইল, আজীন্দ্রের মুক্তির জন্য। এবং রাজেন্দ্রকে ধরিয়া আনিতে লোক পাঠাইল। রাজেন্দ্র ও তৃপ্তি ঘরে ঢুকিতেই সমরেন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, 'কে, আজীন এলি ?'

'না বাবা আমি !' বলিয়া তৃপ্তি শয্যার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

সমরেন্দ্র কিছু বলিলেন না।

গত তিন বৎসরের মধ্যে তিনি একবারের জন্যও আজীন্দ্রের নাম মুখে আনেন নাই। কিন্তু তাহাকে আনাইবার জন্য দরখাস্ত করা হইয়াছে শুনিয়া অবধি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছেন না। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছে সে বুঝি ঐ আসিল।

সমরেন্দ্র চোখে ভাল দেখিতে পাইতেন না। রাজেন্দ্রকে পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে ? আজীন ?'

রাজেন্দ্র। না, আমি—আমি রাজেন।

সমর। ও !—বোসো।—বড্ড গরম বোধ হচ্ছে, না ?

তৃপ্তি। হাঁ বাবা জানালাটা খুলে দিই।

জানালা খুলিতেই এক ঝলক আলো সমরের চোখে আসিয়া পড়িল। সমরেন্দ্র আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেম, 'চাঁদ উঠেছে—না ?'

তৃপ্তি। হাঁ, বাবা। আজ পূর্ণিমা।

সমর। বন্ধ ক'রে দাও! বন্ধ ক'রে দাও!—ও চরকা আমার দুচক্ষের বিষ! ঐ চাঁদের বুড়ি চিরকালটা চর্‌কা কাট্‌চে,—না? কিছু করেছে কি? কিছু বুনেছে কি?—রাজেন?

রাজেন্দ্র। আজ্ঞে –

সমর। আজীন যে এমনি ক'রে আমাকে ত্যাগ কর্‌লো, কিছু লাভ হয়েছে কি তার? কিছু পেয়েছে কি?—কিছু নয়,—কি বল?

রাজেন্দ্র। না—

সমর। আমিও তাই বল্‌চি। মিছামিছি আমাকে এই কষ্টটা দিলে।—কে?

বিনয় অগ্রসর হইয়া বলিল, 'আজ্ঞে, আমি।'

সমর। কে?

বিনয়। আমি, বিনয়।

সমর। বিনয়?—আজীন এলো না, না?—কে এলো?

রাজেন্দ্র। শিরোমণি-মশায় এসেছেন।

সমর। ও! শিরোমণি মশায়?—নমস্কার।—কোথায় আপনি?

শিরোমণি। এই যে, এইখানেই আছি।

সমর। শিরোমণি-মশায়, আপনারা অনেক শাস্ত্র পড়েছেন। আমাকে একটু শান্তি দিতে পারেন? একটা কিছু প'ড়ে শোনান না আমাকে।

শিরোমণি। হ্যাঁ, শোনাব বৈ কি।

তার পর তৃপ্তির দিকে ফিরিয়া ইসারা করিলেন।

তৃপ্তি আলাদা আসন পাতিয়া দিল। শিরোমণি চণ্ডী পাঠ করিতে লাগিলেন। রোগে শোকে চণ্ডীপাঠের মত আর কি আছে?

বুকের উপর দুই হাত এক করিয়া সমরেন্দ্র শুনিতেছেন, আর

শিরোমণি পড়িয়া যাইতেছেন। সমরের ভক্তির লক্ষণ দেখিয়া বেশ উৎসাহের সহিতই পড়িতেছেন। কিন্তু 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি' ইত্যাদির প্রথম আবৃত্তিতেই সমর চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'না, না, না, না,। রূপ চাই না, জয় চাই না, যশ চাই না, শত্রুর নিপাত চাই না। আপনি আর কিছু পড়ুন।'

শিরোমণি তখন গীতা লইয়া বসিলেন। মৃত্যুসময় তত্ত্বকথায় প্রয়োজন আছে বৈ কি!

কিন্তু ইহাতেও ফল হইল না। সমর বলিলেন, 'না শিরোমণিমশায়, দেহ জীর্ণবাসের মত জেনে আমি শান্তি পাব না।—ও রেখে দিন।'

শিরোমণি। কিছু স্তব-টব শুনবেন?—গঙ্গাস্তব?

সমরেন্দ্র মুখ বিকৃত করিলেন। বলিলেন, 'শিরোমণিমশায়, আমি মহাপাতকী। একটা নদীর ধারে শাল গাছ আছে, বা তালগাছ আছে শুনে আমার ভক্তি হয় না। আপনি—আপনি অযোধ্যাকাণ্ড থেকে প'ড়ে শোনান। ঐ বুড়া দশরথের দশাটা ঠিক আমারই মত ছিল না? তার সোনারচাঁদ ছেলেটা ভুয়া ধর্ম্মের কুহকে প'ড়ে তাকে গর্ব্বভরে ত্যাগ ক'রে গেল—এই আত্মীনটার মত।'

শিরোমণি মনে মনে আঘাত পাইলেন, 'লোকটা বলে কি?' অথচ তাঁহার বুকের উপর ভক্তির চিহ্নটি ঠিক তেমনি আছে!

অযোধ্যাকাণ্ড শুনিতে শুনিতে সমরেন্দ্র 'আ হা হা!' 'বা' বা!' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তিনি কিছুই শুনেন নাই। মানসচক্ষে তিনি তখন দেখিতেছিলেন, রামচন্দ্রকে। কবাটবক্ষা যুবা একান্ত নির্ভরপর পিতামাতাকে জীর্ণবাসের মত ত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন, বিশ্বজনের বাহবা শুনিতে শুনিতে! মুখে তাঁর সস্মিত বিনয়নম্রতা, অন্তরে অদম্য আত্মশ্লাঘা!

সহসা সমরেন্দ্র অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

'রাজেন,—তৃপ্তি,—কৈ বিনয় কৈ!'

বিনয়। আজ্ঞে, এই আছি।

সমর। আজীনের সঙ্গে আমার দেখা হবে না। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কে আমার প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা আছে। আর, ঐ আয়রণ সেফে আমার উইল রৈলো।

সকলেই মনে করিল শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে।

শিরোমণি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'তাইত! লোকটার পুণ্যের শরীর দেখ্‌চি! ধর্ম্মকথা শুনতে শুন্‌তেই—!'

সমরেন্দ্র বলিতে লাগিলেন, 'আমার একটা অনুরোধ, আমার শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে ঐ সেফ্‌ কেউ খুলো না।'—

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'আমার আত্মার সদ্গতির জন্য অর্দ্ধেক টাকা উড়িয়ে দেবো, এটা আমি চাই না।'

শিরোমণি মুখ বাঁকাইলেন। 'কৃপণের দুর্ভাগ্য! জীবদ্দশায় আত্মাকে কিছু দিল না, মরিয়াও দিতে চায় না। পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা! আর ছেঁড়া চটি প'রে দিন কাটিয়েছে!'

সমরেন্দ্র একটা কি বলিবার চেষ্টা করিলেন। একবার 'আমার'—বলিয়া আর কিছু বলিলেন না। অন্তিম সময়ের কোন কথায় পাছে কাহারও মর্ম্মপীড়া ঘটান, শেষ আদেশের শৃঙ্খলে পাছে কাহাকেও বিড়ম্বিত করেন, এই ভয়ে মুখ বন্ধ করিলেন। ঝিনুকের মত সেই যে মুখ বন্ধ করিলেন, সে মুখ আর খুলিল না।

শিরোমণিকে আশ্বাস দিয়া সমরেন্দ্র ইহার পর কয়েক দিন বাঁচিয়া ছিলেন। এই কয় দিনে তাঁহার মুখ হইতে একটি কথাও কেহ শুনে নাই।

চব্বিশ

যে রাজেন্দ্রকে লোক দিয়া ধরিয়া আনা হইল, তিনি আর বাড়ীর বাহির হইলেন না, ইহাতে সকলেই বিস্মিত হইল।

প্রথম প্রথম অবশ্য বাহির হইবার উপায় ছিল না। কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় তখন ধর্ম্ম লইয়া যুদ্ধ বাঁধিয়াছে। সাধারণ যুদ্ধে combatant, non-combatant বলিয়া দুইটা ভাগ থাকে। নিরস্ত্র লোক যুদ্ধক্ষেত্রের পাশ দিয়া যাতায়াত করিতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধে সেরূপ হয় না। ধর্ম্মের জন্য লোকে যখন প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে ছুটে, তখন সে আর বাছ-বিচার করে না,—যাহাকে পায়, তাহারই প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া বসে। পাড়ায় একটা পাগল ছিল। স্বর্গ-কামনায় তাহারও পিঠে কে ছোরা বসাইয়াছে। একজন অথর্ব্ব বৃদ্ধকে স্বর্গের টিকিট মনে করিয়া পাঁচ পাঁচটি জোয়ান মর্দ্দ কাড়াকাড়ি করিয়া নিঃশেষ করিয়াছে,—এমন জনরবও শুনা গেল। কাজেই সে সময়ে কেহ পারত পক্ষে পথে বাহির হইতেন না।

রাজপুরুষদের চোখের সাম্‌নে কতকগুলা হ্যাংলা লোক তাহাদের ভাঙা জাঁতি, খাস্ত লইয়া চিরকাল লড়াই চালাইতে পারে না। তিন দিনে যুদ্ধ শেষ হইল, সরকারের ডাক আবার চলিতে লাগিল, কলিকাতার রাস্তায় আবার ডোম মেথর দেখা দিল। তখনও রাজেন্দ্র বাহির হইলেন না। তৃপ্তি ভাবিল, শেষ সময়ে পিতার কাছাকাছি থাকিবার জন্যই হয়ত।

সমরেন্দ্রের মৃত্যুর পরও রাজেন্দ্র ঘরে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। তৃপ্তি ভাবিল, হয়ত শোক পাইয়াছেন।

তিনচারি দিন কাটিয়া গেল। এখনও ঘরে বসিয়া আছেন।

কাহারও সহিত কথা ক'ন না। কেও কাছে আসিলে বিরক্ত হন। বিশেষ কিছু কাজও করেন না। এতটা শোক কোথা হইতে আসিল?

তৃপ্তি ভয় পাইল।

নিঃশব্দপদে রাজেন্দ্রের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তিনি একমনে গড়গড়া টানিতেছেন।

তৃপ্তি পাশে গিয়া বসিল। রাজেন্দ্র লক্ষ্যই করিলেন না।

তৃপ্তি। তুমি আর রোরোও না ত!

রাজেন্দ্র ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তৃপ্তি। অমন ক'রে কি দেখচো তুমি?

রাজেন্দ্র। এঁ্যা?

তৃপ্তি। ঘরের মধ্যে এই রকম বন্ধ হ'য়ে থাকলে অসুখ করবে যে।

'হুম্' বলিয়া—রাজেন্দ্র গড়গড়ায় মগ্ন হইলেন।

তৃপ্তি। বাবার জন্য বড় শোক পেয়েছ, না?

রাজেন্দ্র। উ হুঁ।

তৃপ্তি। আজীনের কথা ভাবচো?

রাজেন্দ্র। নাঃ!

তৃপ্তি। চিরকাল আমোদ আহ্লাদে কাটিয়েছ। সব ছেড়েছুড়ে বাঁচবে কি ক'রে?

রাজেন্দ্র। হুম্।

তৃপ্তি বসিয়া বসিয়া উঠিয়া গেল, এবং দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

'হুম্।'—বলিয়া রাজেন্দ্র মুখ তুলিলেন। একবার চারিদিকে চাহিয়া কি একটা বলিতে গেলেন' 'এ—আ—''

তৃপ্তির সহিত চোখোচোখি হইতেই সে হাসিয়া ফিরিল। কিন্তু রাজেন্দ্রকে আবার গড়্‌গড়ায় মগ্ন হইতে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, একটু ইতস্ততঃ করিল, তারপর আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা হাতের উপর বাজাইতে বাজাইতে বাহির হইয়া গেল।

এইবার রাজেন্দ্র ডাকিলেন।

তৃপ্তি প্রায় ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিল, এবং তাঁহার হাতের উপর হাত বুলাইতে লাগিল।

রাজেন্দ্র একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, 'তৃপ্তি,—পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা!'

তৃপ্তি। তোমার হ'ল কি গো? এখনও তাঁর শ্রাদ্ধ হয় নি যে!

রাজেন্দ্র। প্রকাণ্ড শক্তি, তৃপ্তি, প্রকাণ্ড শক্তি!—কি করি বলত এটাকে নিয়ে?

তৃপ্তি। কোন সৎকার্য্য করতে চাও?

রাজেন্দ্র। কোন সৎকার্য্য নয়,—The সৎকার্য্য,—village reconstruction, এক পয়সা per head পেলে বাংলার ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর তাড়ান যায়, জান? উঃ! পঁয়তাল্লিশ লক্ষ না হ'য়ে যদি ওটা চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ হ'ত!

তৃপ্তি। বেশ তো তোমার শক্তি মত তুমি দাও। তোমার দেখাদেখি অন্য লোকে ত দিতে পারে। এ দেশে কোটিপতিও ত আছে কেউ কেউ।

রাজেন্দ্র। ঠিক বলেছ! তাই করবো—বড্ড কম টাকা! ওটাকে বাড়াতে হবে। কতকগুলো ভাল Jute shares—

স্বামীর দুশ্চিন্তার বহর দেখিয়া তৃপ্তি হাসিয়া ফেলিল। হাসিয়াই অত্যন্ত লজ্জিত হইল। ছি, ছি! এই কি হাসির সময়!

পঁচিশ

ছুটি পাইয়াও আজীন্দ্র পিতার শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হয় নাই।

বন্ধুরা বলিয়াছিলেন, 'আহা! ছুটি পাচ্ছ,—দুদিন ঘুরে এসো।'

—'প্রয়োজন নেই।'

—'অশৌচান্ত কর্‌বে না?'

—'আমার অশৌচান্ত নেই। আমার অশৌচ আরম্ভ হয়েছে 2nd April, 1926. অন্য কোনও অশৌচ এখন আমাকে স্পর্শ কর্‌বে না।'

'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ'—

আজীন্দ্র এমনি একটা মহাসত্যের চিত্তস্তম্ভীকর সাক্ষাৎ পাইয়াছে। বাংলাদেশের সকল খবর তাহার কাছে পৌঁছিত না। তবে যাহা পৌঁছিয়াছিল তাহারই গুরুত্বে সে মশগুল হইয়া গেল।—

'ক' বাঁশী বাজাইল। তাহাতে 'খ'-এর ধর্ম্মে আঘাত লাগিল। তাই গ আসিয়া ঘ-এর মাথা ফাটাইল।

এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার সে কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই।

আর একটা আশ্চর্য্য, দেশে রক্তস্রোত যত প্রবল হইল, স্বর্গে ততই ভিড় বাড়িতে লাগিল। বস্তিকে বস্তি স্বর্গে চালান যাইতে লাগিল। ভগবানকে ঘেরিয়া তাঁহার প্রিয় ভক্তগণের সে কী ভিড়! একেবারে ফটো তুলিয়া বাঁধাইয়া রাখিবার মত।

নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ চীৎকার করিতেছেন, 'We are fighting! We are fighting!' আর কেহ কেহ বলিতেছেন, 'না, না। নেতারা fight করিবেন কেন? এ সমস্তটাই গুণ্ডাদের কাজ। গুণ্ডারা ধর্ম্মের জন্য মাতিয়াছেন।' 'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়' ভগবান কত বিচিত্ররূপেই না অবতীর্ণ হইয়াছেন! এবারে 'কেশব ধৃত-

গুণ্ডারূপ জয় জগদীশ হরে।' এদিকে আর একদল বলিতেছেন, 'ও ধর্ম্ম-টর্ম্ম মিছা কথা! ব্যাপারটা purely economic. যোগ্যতার পুরস্কার কেবল যোগ্য ব্যক্তিরাই পাইবে কেন? ইহা লইয়াই বিবাদ। তবে এই struggleএ যথেষ্ট মত্ততা ও উৎসাহ আনিবার জন্যই ধর্ম্মের ছাপ দেওয়া হইয়াছে।'

কথাটা সঙ্গত। 'দুধে বিষ মিশাইব। শত্রুপক্ষের ছেলেগুলা ক্ষুধার তাড়নায় এই দুধ খাইবে, আর হাত-পা ছুঁড়িয়া, মুখে গেঁজা তুলিয়া, চোখ উল্টাইয়া, পট্‌পট্‌ করিয়া মরিতে থাকিবে। বাঃ! কি চমৎকার।'

'ঘরে বাহিরে পেট্রল লাগাইয়া আগুন ধরাইয়া দিব। শত্রুপক্ষের কতকগুলা লোক ঘরের মধ্যে অতিষ্ঠ হইয়া, ব্যাকুলবিস্ফারিত নেত্রে জানালার কাছে ছুটিয়া আসিবে। আসিয়া দেখিবে রাস্তা জুড়িয়া আগুন জ্বলিতেছে ধূ ধূ করিয়া! হো! হো! হো! হোঃ! কি মজা! কি মজা!'

এইরূপ virile মনোভাব কোন পান্‌সে economic struggleএ আসিতে পারিত না। তাই বোধ হয় 'ধরম মশলা'র প্রয়োজন হইয়াছে।

সেই দাঙ্গায় অনেকের চোখ খুলিয়া গেল। আজীন্দ্রেরও খুলিল,—একটু বড় করিয়া। তাহার চোখ ঠিকরাইয়া পড়িবার মত হইল। এত ধর্ম্ম এই দেশের মধ্যে কুণ্ডলায়িত হইয়া ছিল কোথায়? এত ধর্ম্ম যাহার, তাহার ত আর কিছু না থাকিলেও চলে। আর কিছু থাকেও না ত। তাহার জন্য স্বর্গই অক্ষয় হউক। মর্ত্ত্যের বাস সে যত শীঘ্র পারে, উঠাইয়া দিক্‌।

ছাব্বিশ

শ্রাদ্ধ খুব ঘটা করিয়াই হইল। সমরেন্দ্রের নিষেধ সত্ত্বেও অনেক টাকা খরচ করা হইল, প্রেতকে তৃপ্ত করিবার জন্য। টাকাটা ধার করিয়া আনা হইয়াছিল। কারণ, Iron-safe সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ কেহ অমান্য করে নাই।

আজীন্দ্র আসিয়া পৌঁছিল না। তাহার অবর্ত্তমানেই উইল পড়া হয়। একখানি পত্রে সমরেন্দ্র উইলের মর্ম্মার্থ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন:—

পিতার নিকট হইতে আমি পনেরো লক্ষ টাকা পাই। টাকাটাতে কলঙ্কের দাগ আছে জানিয়া আমি ইহা স্পর্শ করি নাই—ইহা হইতে এক পয়সা খরচ করি নাই, ইহাতে এক পয়সা যোগ করি নাই। ব্যাঙ্কে থাকিতে থাকিতে সেটা আপনা আপনি ফুলিয়া চল্লিশ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। ইচ্ছা ছিল, এই টাকা দিয়া পাঁচজনের উপকার করিব। কিন্তু কম টাকায় সব চেয়ে বেশী উপকার কিরূপে করা যাইতে পারে ইহা ভাবিতে ভাবিতেই আমার দিন কাটিয়াছে, কিছু করিতে পারি নাই। শেষাশেষি ছেলেদের ব্যবহারে প্রতিদিন কর্ত্তব্যের ধারণা বদলাইয়া যাইত। লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারি নাই। আমি জানিতাম, এই টাকা ছেলেদের হাতেই রাখিয়া যাইতে হইবে। কারণ, পৈতৃক চোরাই মাল হইতেও তাহাদের বঞ্চিত করা যায় না।

ছেলেদের মানুষ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাঁহারা মানুষ হইয়াছেন। তবে যে ভাবে মানুষ হইয়াছেন তাহাতে ছোটটির সত্তায় আমার আস্থা নাই, বড়টির 'সততার' উপর নির্ভর করিতে পারি না। তবু, ইহাদের মধ্যে ছোটটিই যোগ্যতর মনে করিয়া, তাঁহার হাতেই

সব টাকাটা রাখিয়া গেলাম। তাঁহার ধর্ম্ম যাহা হয় করিবেন। কোন উপদেশ দিলাম না। কারণ, আমার আর উপদেশ দিবার বয়স নাই।

আমার স্ত্রীর নিকট হইতে তিন লক্ষ টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম। তাহাই স্বদে খাটাইয়া প্রায় পাঁচ লক্ষে দাঁড় করাইয়াছি। এইটা দুই ছেলেকে সমান ভাগে ভাগ করিয়া দিলাম।

আমার নিজের উপার্জ্জন হইতে কষ্টে সংসার চালাইয়াছি। তাহা হইতে কিছু উদ্বৃত্ত নাই।

কলিকাতার বাড়ী ও দেশের ভদ্রাসনে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া জানি না। করে নাই, এইরূপই ধরিয়া লইয়াছিলাম,—হয়ত নিজের সুবিধার জন্য। এই দুটিতে ছেলেদের সমান স্বত্ব রহিল। ইহাদের গ্রহণ-বর্জ্জনে তাঁহারা নিজেদের কর্ত্তব্যবুদ্ধিমত চলিবেন। তাঁহাদের কল্যাণ হোক্।"

সমস্ত চিঠিখানার মধ্যে রাজেন্দ্রের কানে বাজিতে লাগিল, কেবল একটি লাইন—'বড়টির সততার উপর নির্ভর করিতে পারি না।'

তিনি মনে মনে হাসিলেন। 'Thus we are judged! কৈ dishonest কাজ কি করেছি কখনো?'

তারপর আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন, 'Poor fellow!'

এটা তিনি পিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। লোকে মনে করিল তিনি নিজেকেই নির্দ্দেশ করিতেছেন।

বাস্তবিক উক্তিটি তাঁহার প্রতিই আজ বিশেষ ভাবে প্রযুজ্য। আজ তাঁহার মত কৃপার পাত্র আর কে?

সমগ্র বঙ্গদেশকে নূতন করিয়া গড়িবার বিশ্বকর্ম্মা আজ একেবারে নিষ্কর্ম্মার দলে! এরোপ্লেন হইতে তিনি লাফ দিলেন ষ্টীমার লক্ষ্য করিয়া, ষ্টীমার সরিয়া গেল। তিনি পড়িলেন অতল জলে।

তার পর, শ্বাসরোধকর নিবিড় অন্ধকারের ধাক্কাটা সামলাইয়া ভাসিয়া উঠিতেই দেখিলেন, দিগ্‌দিগন্তে কোথাও এমন কিছু নাই যাহার জন্য হাত-পা ছুঁড়িয়া বাঁচিতে ইচ্ছা করে।

নিজের এই অবস্থা তিনি প্রথমে উপলব্ধি করেন নাই। ক্রমে ক্রমে করিলেন। পিতার সম্পত্তিতে আজীন্দ্রের সমান অধিকার থাকিবে, ইহা তাঁহার জানা ছিল। তবু, আজীন্দ্র তাঁহার এতই আপনার, যে তাহার অংশও নিঃসঙ্কোচে ব্যয় করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু যেমনি দেখিলেন পিতার উইলে আজীন্দ্র বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে—অমনি সে পর হইয়া গেল। অমনি তাহার অর্থ অস্পৃশ্য হইয়া গেল।

কর্ম্ম ফুরাইয়াছে। এইবার রাজেন্দ্র ভোগের পঙ্কিলতার মধ্যে ফিরিয়া যাইবেন, এইরূপ সকলে অনুমান করিতেছিল। কিন্তু তিনি ফিরিলেন না। Long distance Raceএ প্রথম হইবার আশায় যে লোক নামিয়াছে, সে কি অর্দ্ধপথে বাধা পাইবা মাত্র সাধারণ দর্শকের দলে ফিরিয়া যাইতে পারে? পারে না। রাজেন্দ্রও পারিলেন না। মনের প্রচণ্ড গতিবেগ লইয়া স্থির হইয়া রহিলেন।

স্বামীকে একান্তভাবে কাছে পাওয়াই ছিল তৃপ্তির জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা। দেবতার বরে আজ সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। আজ এক পলের জন্যও স্বামী চোখের আড়াল হ'ন না। কিন্তু হায়! দেবতার বরের মধ্যে যে এত অভিশাপ লুকাইয়া থাকিতে পারে, কে জানিত? কে জানিত, স্বামীকে কাছে পাওয়াই হইবে তাহার মৃত্যু-শেল?

স্বামীর বর্ত্তমান উদ্যমহীন, উৎসাহহীন, আনন্দহীন জীবন তৃপ্তিকে অধীর করিয়া তুলিল। অথচ, সে যে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পায়

না। স্বামী যদি আজ আবার তাঁহার পুরাতন তাস, পাশা, শেরী, শ্যাম্পেনের মধ্যে ফিরিতে চাহিতেন, ত সে সর্ব্বান্তঃকরণে সায় দিত।

তৃপ্তির মাথায় একটা প্ল্যান আসিল।

রাজেন্দ্র চেয়ারে বসিয়া আছেন। কর্ম্ম নাই—সম্মুখে চাহিয়া বসিয়া আছেন। তৃপ্তি গিয়া পাশে বসিল।

রাজেন্দ্র তৃপ্তির হাঁটুর উপর একখানি হাত রাখিলেন।

দুইজনে এইভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। সাম্‌নের জানালাটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া রাজেন্দ্র বলিলেন, 'ঐ মাছিটার কাণ্ড দেখ। বার বার শার্শির ওপর মাথা ঠুক্‌বে। কিছুতেই বুঝ্‌তে পারবে না যে ওখানে কোন বাধা আছে, হিঃ!' হাসিয়া তৃপ্তির দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সে তাঁহারই মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

"দূর! আমার মুখেব দিকে চেয়ে আছে!"—বলিয়া তিনি তৃপ্তিকে একটা ধাক্কা দিয়া মুখ ফিরাইলেন।

মুখের হাসি দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল।

তৃপ্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজেন্দ্রের সম্মুখীন হইয়া বলিল, 'আচ্ছা, তোমার হাতেও ত আড়াই লাখ টাকা আছে। তারির দু'লাখ টাকায় ত অনেক কাজ করা যেতে পারে।'

রাজেন্দ্র। কি? ঘুড়ি ওড়ান?

তৃপ্তি। কেন, ঘুড়ি ওড়ান কেন? দু'লাখ টাকাই কি কম না কি?

রাজেন্দ্র। হাতের ময়লা!

তৃপ্তি। আচ্ছা, তুমি না পার আমাকে দাও। আমি কাজ কর্‌বো।

রাজেন্দ্র। কি শুনি।

তৃপ্তি। দুটো মোটরকারে ক'রে চারজন টিচার পাঠাব। তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরবে, লোকের সঙ্গে মিশবে, তাদের লেখাপড়া শেখাবে, কাজ করতে শেখাবে,—

রাজেন্দ্র দুইবার মাথা নাড়িয়া সবটা তুচ্ছ করিয়া দিলেন।

তৃপ্তি। কেন? এর মধ্যে কি গলদ আছে, বল। আমি ত বুঝতে পারচি না।

রাজেন্দ্র। বুঝে দরকার নেই। তার চেয়ে তুমি এক কাজ কর,—আমাকে একখানা বই দিয়ে যাও।—দেখ দিকি, humorous কিছু পাও যদি।—আচ্ছা, থাক্! তুমি ঐ French বা German primer একখানা নিয়ে এসো।

তৃপ্তি বই আনিয়া রাজেন্দ্রের হাতে দিল। তার পর, বইশুদ্ধ হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল। বলিল, 'আচ্ছা, কেন হবে না, বল।—কেন হবে না, আমাকে বুঝিয়ে দাও।'

তৃপ্তির চোখে জল আসিয়া পড়িল।

রাজেন্দ্র একটু হাসিলেন। তৃপ্তির পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, হবে হবে!'

তৃপ্তির ইচ্ছা করিল আর একটু ঘেঁসিয়া যায়, হাতের স্পর্শটি একেবারে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করে, স্বামীর কাঁধে মাথা রাখিয়া অকারণে এক পশ্লা কাঁদিয়া লয়।—কিন্তু সাহস হইল না।—অনেক দিন অভ্যাস নাই!

সাভাশ

আজীন্দ্র মুক্তি পাইয়াছে। যে ইজি চেয়ারে করিয়া তাহাকে গাড়ী হইতে নামান হইয়াছিল, সেই চেয়ারেই সে শুইয়া আছে। উঠিবার প্রবৃত্তি হয় নাই।

তৃপ্তি তাহাকে দেখিয়াই শিহরিয়া উঠিল।—

'ও রে, তুই কি চেহারা ক'রে এসেছিস্!'

আজীন্দ্র। চেহারাটা খারাপ হয়েছে, একটু। পথের কষ্ট।—তারপর এই ভীড়!

তৃপ্তি। তুই কিছু খা।

আজীন্দ্র। খাওয়াবার নাম ক'রে এখুনি উঠে যাবে। না, বৌদি তুমি বোসো। আমি খেয়ে এসেছি।

চেয়ারের হাতলের উপর আজীন্দ্র তৃপ্তির হাত চাপিয়া ধরিয়া রাখিল।

তৃপ্তি। বাবা! দেশের কাজ করার এই শাস্তি!

আজীন্দ্র। দেশের কাজ করিনি, বৌদি। মরীচিকার পিছনে ছুটে ছুটে জীবনটাকে নষ্ট করেছি। আজ তাই মনে হয় কি ভুলটাই করেছি!—দেশ?—আমার কোন দেশ নেই। আজ বিংশশতাব্দীতেও যেখানে ধর্ম্ম দিয়ে মানুষ বিচার হয়, শুধু বাহাদুরী দেখাবার জন্য নিরীহ, নিরস্ত্র নরনারীকে কাপুরুষের মত হত্যা করবার লোক যেখানকার পথে ঘাটে বিষ্ঠাকীটের ন্যায় অগণ্য, যে দেশে সুশিক্ষিত ও কুশিক্ষিতের মধ্যে মতভেদ নেই—সে আমার দেশ নয়। পুঁথির পাতা নির্ব্বিচারে মেনে চলায় যাদের গৌরব, ভায়ের পিঠে ছুরি বসানকে যারা বীরত্ব মনে করে, যাদের পৌরুষের প্রকাশ অবলার প্রতি অত্যাচার,—তারা আমার কেউ

নয়, কেউ নয়, কেউ নয়!—অথচ, কোথাও পালাবার স্থান নেই! সপ্তদ্বীপার সহস্র সিংহদ্বারে কোথাও একটু ছিদ্রও নেই, আমার প্রবেশের জন্য!—আমি কি করি, বৌদি?—আমি কি করি? ইংরাজ, জার্ম্মান, আমেরিকানের মত শিক্ষা ও সভ্যতা নিয়ে আমাকে এই Maori head-hunterদের মধ্যেই বাস করতে হয়? সুন্দরবন যোগ্যতা লাভ করলে তবে মানুষের অধিকার পাব?—মৃত্যু ভাল! মৃত্যু ভাল!

বলিতে বলিতে আজীন্দ্র উঠিয়া বসিয়াছিল। তৃপ্তি তাহাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিল। এবং চোখ মুছিয়া বলিল, 'তুই একটুতে বড় উত্তেজিত হয়ে উঠিস্।'

আজীন্দ্র। একটু, বৌদি? জীবন, যৌবন নিঃশেষে দান করলুম। কখনো সুখ পেলুম না, সঙ্গ পেলুম না। অভ্রভেদী দুঃখের রথচক্রতলে দলিত বিকলাঙ্গ হয়ে, আজ মৃত্যুর দ্বারে এসে দেখচি, আমার সমস্ত দেহমনের একাগ্র শক্তি অর্পণ ক'রে এতদিন বাষ্পের প্রতিমা গড়্‌তে চেয়েছিলুম।—একটুখানি ব্যাপার এটা?

তৃপ্তি। না, ভাই, তোর এতবড় সাধনা কি নষ্ট হ'তে পারে? আমি বলচি, ও কিছুতেই ব্যর্থ হবে না।

আজীন্দ্র। ব্যর্থ হয়ে গেছে। স্বপ্নের ওপর কি ভিৎ গাঁথা যায়? তা যায় না। তা যায় না।

তৃপ্তি। তোরা পুরুষ মানুষ, এত হতাশ হ'লে কি চলে?

আজীন্দ্র। দেবী ব'লে পূজা করলুম। তখন বুঝতে পারিনি। আমার সমস্ত রক্ত শোষণ করে নিয়ে আজ পিশাচী মুখোস খসিয়েছে! কোথায় গেল সেই 'অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা?' আমি দেখলুম,—'অতি-বিস্তারবদনা, জিহ্বাললনভীষণা, নিমগ্নারক্তনয়না, নাদাপুরিতদিঙমুখা।'

তৃপ্তি। ও দুটোইত এক মায়ের রূপ, ভাই।

আত্মীন্দ্র। কবিত্ব কোরো না। যদি জান্‌তুম আমার 'অতসী-পুষ্পবর্ণাভা'র অন্তরালে এই মূর্ত্তি আছে তবে সেই দণ্ডে সমস্ত পদাঘাতে চূর্ণ ক'রে দিয়ে চ'লে যেতুম। দাসত্ব কর্‌তুম,—সাহেবের জুতাবরদার হয়ে জীবন কাটিয়ে দিতুম,—সুখী হতুম।

তৃপ্তি। আমার ওপর দয়া কর্, ভাই। অমন করিস্ নে। আমি বল্‌চি, তোর এই দেশ আবার সভ্য হবে, উন্নত হবে,—তোর তপস্যা সফল হবে।

আত্মীন্দ্র। অসম্ভব! ছ হাজার বৎসরের মধ্যে নয়। ততদিনে পৃথিবীর বাকী লোকগুলা আর একটা উচ্চতর স্তরে বিবর্ত্তিত হ'য়ে যাবে। তাদের সঙ্গে এদের কোন যোগ থাক্‌বে না।

তৃপ্তি। তোর মনটা এখন খারাপ আছে। এখন আর কথা বলিস্‌নে। বিশ্রাম কর্।

আত্মীন্দ্র। আমার আবার বিশ্রাম কি, বৌদি? আমার ত সবই বিশ্রাম! একদম্ ছুটি!

তৃপ্তি। তোর কি দয়া মায়া নেই একেবারে? আমার সাম্‌নে এমনি ক'রে কথা বলিস্?

আত্মীন্দ্র। না, বৌদি, ভুল করেছি। অমন কথা আর বলবো না।—পিঠের কাছে বালিশটা ঠিক ক'রে দাও না, বৌদি।

তৃপ্তি বালিশ ঠিক করিয়া দিতে দিতে বলিল, 'একেবারে বাড়ীর ভেতরে গিয়ে শুলে ত হয়।'

আত্মীন্দ্র দুই চক্ষু নিমীলিত করিয়া পড়িয়া রহিল। 'হাঁ, না' বলিতেও যেন কষ্ট হয়। 'এই রূপ! এই পৌরুষ!'

আটাশ

আজীন্দ্রের জীবনজোড়া দারুণ নৈরাশ্য ও নিবিড় অবসাদের নিবাত-নিষ্কম্প সমুদ্রেও চাঞ্চল্য জাগাইল পিতার উইল।

সমরেন্দ্র যে তাহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন, এ কথা সে কখনও ভাবিতেও পারে নাই। বরং তাহার বিশ্বাস ছিল যে দুই পুত্রের মধ্যে তাহার উপরেই পিতার বিশেষ বিরূপতা আছে। পিতার সহিত হৃদয়ের যোগ খুব ঢিলা ভাবেই ছিল বলিয়া সে তাঁহার মৃত্যুকে এত তুচ্ছ করিয়া দেখিতে পারিয়াছে। একথা মনে করিয়া আজ তাহার অনুশোচনা হইল। কিন্তু সেও ক্ষণিকের জন্য।

টাকাটার সম্বন্ধে তাহার যে কিছু কর্ত্তব্য থাকিতে পারে সে কথাও তাহার মনে হয় নাই। কোন দায়িত্ব বহন করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না বলিয়া, কোন দায়িত্বই সে গ্রহণ করিল না।

তাই তৃপ্তি যখন জিজ্ঞাসা করিল, 'অত টাকা দিয়ে কি কর্‌বি, কিছু ঠিক করেছিস্?' সে শুধু উত্তর করিল, 'কি আর কর্‌বো? একটা সৎকার্য্য কর্‌তে পারি,—ওটাকে কোন স্বদেশী ব্যাঙ্কে-এ জমা দেওয়া।

তৃপ্তি। সে ত দিতেই হবে কিন্তু শুধু তাতেই ত কিছু কাজ হবে না।

আজীন্দ্র। আর কাজ করবার প্রবৃত্তি নেই, বৌদি।

তৃপ্তি। তবে আমাকে দিয়ে দে-না। আমার একটা প্ল্যান আছে, কর্ম্মী পাঠিয়ে পল্লীসংস্কার করা।—তুই সৎকার্য্যেই খরচ কর্‌বি ত?

আজীন্দ্র। হাঁ বৌদি। সৎকার্য্যেই খরচ করতে হবে। আর এর মত সৎকার্য্যও আর পাওয়া যাবে না।—তবে তুমিই নাও, বৌদি, টাকাটা। সব নাও। ওতে আমার কিছু দরকার নেই।

তৃপ্তি লাফাইয়া উঠিল। 'তাহ'লে তোর দাদার হাতে সব দিয়ে দিই? তিনিই কাজ করাবেন কিন্তু।'

আজীন্দ্র। তাঁর হাতেই ত দিতে হবে। আমরা কেবল বোমার মত ফাটাতে পারি, drillএর মত ফুটো কর্‌তে পারি না। সেটা তিনি পার্‌বেন।

তৃপ্তি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। একটি অনুপম আনন্দ কয়লার খনিতে shaftএর ভিতর দিয়া সূর্য্যালোকের ন্যায় আজীন্দ্রের অন্তরে প্রবেশ করিতে করিতে থামিয়া গেল।

চিকিৎসার গুণে ও তৃপ্তির সেবায় আজীন্দ্র একটু একটু সুস্থ বোধ করিল। একটু সুস্থ বোধের সঙ্গে একটু আনন্দ থাকে।

ক্রমে বন্ধুবান্ধবের সমাগম হইতে লাগিল। তাহার মধ্যেও কিছু সুখ আছে বৈ কি।

একদিন বিনয়, বঙ্কিম, ও মহিম তাহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। বঙ্কিমকে দেখিয়াই আজীন্দ্র বলিল, 'আমাকে মাফ কর্‌বেন,—আপনার ওপর বড় অবিচার করেছিলুম।'

বঙ্কিম। কেন, কেন, কি হ'ল?

আজীন্দ্র। এক সময়ে আপনার কথায় আমার বড় রাগ হত। আমি—

বঙ্কিম। আমি কথা বলবার সময় নিজের কথা বলি, রামসদয়ের কথা বলি না। তাই সবাই আমার ওপর চটে যায়।

আজীন্দ্র। আমিও চটেছিলুম। কিন্তু এখন বুঝেছি, আপনার কথাই ঠিক। ইংরাজ আমাদের চেয়ে ঢের বড়।

বঙ্কিম। বড় কিসে? লম্বায়?

বঙ্কিমের মুখ হইতে এরূপ উত্তর সে প্রত্যাশা করে নাই। তাই কেমন থতমত হইয়া গেল।

বঙ্কিম বলিতে লাগিলেন, 'আমাদের চেয়ে ঢের বেশী physical comforts তারা পায়, ঢের বেশী educational facilities. আমাদের মধ্যে জন্মেছেন গান্ধী, রবীন্দ্র, আশুতোষ, দেশবন্ধু। এঁদের চেয়ে twenty times as great, or twenty times as many বড় লোক যদি তাদের মধ্যে থাকে, তবে তাদের বড় বলবো।

মহিম। বড় লোক অনেক আছে বৈ কি।

বঙ্কিম। Name them.

বিনয়। তুমি যাঁদের নাম করলে, তাঁরাও ত ইংরাজী শিক্ষার ফল।

বঙ্কিম। Don't you believe it. Inherent greatness না থাক্‌লে, শুধু A. B. C. পড়িয়ে কাউকে বড় করা যায় না। রামমোহন বিদ্যাসাগর, ইংরাজী শিক্ষার ফল নয়।

মহিম। আর বল্‌বেন না। আমরা শ্যালকুকুরের মত পথে ঘাটে পরস্পরের টুঁটি ছেঁড়াছিঁড়ি করি।

বঙ্কিম। টুঁটি ছেঁড়াছেঁড়ি করিছি ত প্রভুদের চোখের সাম্‌নেই। এই বীভৎস নৃশংসতায় কৈ তাঁরা ত আজও পাগল হয়ে যান নি। তাঁদেরই বা এত বড় বল্‌বো কেন? তাঁদের higher sensibilities আছে, একথাই বা মান্‌বো কেন?—আর এই টুঁটি ছেঁড়াছিঁড়ি বিলেতে হয় না? আমেরিকার Ku-klux-Klan কি? ভোট দাও বল্‌তে বল্‌তে মেয়েগুলো পরের জান্‌লা ভেঙে চুরমার কর্‌লো যে!

বিনয়। তার সঙ্গে এই দাঙ্গার তুলনা হয় না।

বঙ্কিম। তাদের সঙ্গে এদের অবস্থারও তুলনা হয় না। এরা যে

বস্তিতে থাকে সেখানে তারা গরুবাছুর পর্য্যন্ত রাখে না। এদের বর্ত্তমান অন্ধকার, ভবিষ্যতে আশা নেই। ইউরোপের কোন লোককে এই অবস্থায় রাখলে সে শুধু সার্শি ভেঙেই ক্ষান্ত হ'ত না। দুদিন unemployed থাক্‌লে তারা dangerous elements in society হ'য়ে দাঁড়ায়। আর এরা অনাহারেই জীবন কাটিয়ে দিল! এতদিন কিছু করেনি, সে ত আশ্চর্য্য! সেই জন্যই তাদের পূজো করা উচিত।

বিনয়। দাঙ্গাটা হ'ল কি জন্যে দেখ।—দুটো কেরাণীগিরি পাবার জন্য!

বঙ্কিম। কেরাণীগিরী পাবারই আকাঙ্ক্ষাই ত মনুষ্যত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা। কেরাণী, আর potential কেরাণীরাই ত বাংলাদেশকে বড় করেছে। আমরা সবাই যদি কোটিপতি হয়ে বড়বাজারে গাদাগাদি কর্‌তুম, ত দেশে নাম কর্‌বার মত কিছু থাক্‌তো না।

মহিম। তাই ব'লে indiscriminate—

বঙ্কিম। জড়ত্ব থেকে জাগরণের first symptom is indiscriminate movement.—তোমরা শুধু লাঠালাঠির দিকটাই দেখ্‌চো। হিন্দু মুসলমানের লাঠালাঠি হ'ল দেশ জুড়ে। তবু, এখনও আমাদের মত সাধারণ লোক অসংখ্য রয়েছে, যাদের মনে কোন বিদ্বেষ নেই, যারা হিন্দু, মুসলমান দুজনকেই আজও ভাই ব'লে কোলে টান্‌তে পারে। এটা বুঝি কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়? Say, whatever you like, আমরাও ঢের বড়। কামানের range মেপে মানুষের ছোট বড় বিচার হয় না।

বঙ্কিমের এই পরিবর্ত্তনে আজীন্দ্র এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াছিল। কোন কথা বলে নাই। এইবার বলিল, 'আপনার এ মত ছিল না কিন্তু।'

বঙ্কিম। No. I was a fool then.

বঙ্কিম সকল কথাই বাড়াইয়া বলেন। বাড়াবাড়ি বাদ দিলেও, তাঁহার কথাগুলির মধ্যে যে আশার বাণী ছিল, সেইটাই আজীন্দ্রের নিকটে, পতিপুত্রহীনার শূন্য আঁচলে নধর লাউডগার মত সুখস্পর্শ মনে হইল।

সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, চক্রবৎ ঘুরিতেছে। কথাটা সত্য। তবে এই চক্রনেমিতে সুখের rubber tyre ঠিক অর্দ্ধেকটা জুড়িয়া থাকে না। আধ ফুট tyre, আট ফুট ফাঁকা, আট ফুট লোহার পর এক ফুট tyre,—এই রকমই প্রায় হইয়া থাকে।

সুখের মাত্রা খুব কম হইলেও, আজীন্দ্র যে কিছু সুখ পাইয়াছে, জীবনে অনাস্থা যে কিছু কমিয়াছে, ইহা সে বুঝিতে পারিল, যেদিন মনে হইল মাধুরীকে না দেখিলে সে বাঁচিবে না।

উনত্রিশ

ব্রজদুলাল ১২নং এর বাড়ী বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন, অনেক কাল। এখন তিনি কোথায় থাকেন, কেহ বলিতে পারে না। আফিস মহলে খোঁজ করিলে খবর মিলিতে পারে। কিন্তু আজীন্দ্রের সাহস হইল না। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে, গৃহ ও গৃহলক্ষ্মী হইতে পৃথক করিয়া দেখিতেই ব্রজদুলালকে ছিন্নমুণ্ডের মত ভয়ঙ্কর মনে হইল!

মহিমও বাসা বদলাইয়াছে। তথাপি, আজীন্দ্র তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিল। মহিমের সহিত ইতিপূর্ব্বে তাহার দেখা হইয়াছে। তখন সেও কিছু বলিতে সাহস করে নাই। আজীন্দ্রও এসব বিষয়ে প্রশ্ন করা আবশ্যক মনে করে নাই।

আজ মহিমের কাছে তাহার প্রথম কথাই হইল—'ওহে, মাধুরীর কোন খবর পাচ্চি না। কোথায় গেল তারা জান!'

মহিম। তিনি আমার কাছেই আছেন।

আজীন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া গেল!

'বাড়ীঘর ছেড়ে!'

মহিম। হাঁ। বাড়ীঘর তাঁকে ছাড়্‌তে হয়েছিল। আমি তাঁকে আত্মহত্যা থেকে বাঁচিয়েছি।

আজীন্দ্র। বেশ সুখে আছ?

মহিম। হাঁ ভাই, বেশ সুখেই আছি।

আজীন্দ্র। কোথাও কোন খোঁচা বিঁধ্‌চে না?

মহিম। অন্য লোক হ'লে হয়ত বিঁধতো। কিন্তু তুমি খুব seriously বলেছিলে যে এতে তোমাকে আঘাত দেওয়া হবে না।

আজীন্দ্র। হাঁ, তা বলেছিলুম। তা বলেছিলুম বটে। কিন্তু তুমি পার্‌লে ত!

মহিম। পারলুম ত দেখ্‌চি।

আজীন্দ্র। তোমায় দেখে ত মনে হয়নি, কখনও এমন কাজ কর্‌তে পার।—

মহিম। পারতুম না। ঘটনাচক্রে হ'য়ে গেল।

আজীন্দ্র। বেশ সাধু সেজে থাকৃতে। আমার মনের সব গোপন কথা কুরে কুরে বার ক'রে নিতে। নিয়ে মোহমুদ্গরের শ্লোক আওড়াতে।

মহিম। সাধু সাজিনি ক'নো। সাধুই ছিলুম।

আজীন্দ্র। সাধু ছিলে তাই—?

আজীন্দ্র কথা শেষ করিতে পারিল না। তাহার ইচ্ছা হইল

মহিমের গলাটা টিপিয়া বার দুই ঝাঁকানি দেয়। কিন্তু নিজেকে সংবরণ করিয়া লইল। 'না, আমি যাই।' বলিয়া বিদ্যুদ্বেগে বাহির হইয়া গেল।

কয়েক পদ যাইতে না যাইতেই আজীন্দ্রের মনে হইল কাজটি বড় অশোভন হইয়াছে! নাঃ! তাহাকে ফিরিতে হইল।

তাহার মনে পড়িল, এই মাধুরীকে সেই একদিন বলিয়াছিল, স্বামীর বিশ্বাসঘাতিনী হইলে দোষ নাই। ঢিল মারিয়া বোঁটা খসাইয়াছে সে। এখন ফলটা পড়িবার সময় তাহার বাগানে না পড়িয়া আর একজনের বাগানে পড়িয়াছে। এই আর একজনের উপর রাগ করিলে চলিবে কেন?

আজীন্দ্র ফিরিয়া আসিল। হাত বাড়াইয়া, মহিমের সম্মুখে গিয়া বলিল, 'ভাই মাফ কর,—আমার অন্যায় হয়েছে।—আমাকে খাইয়ে দাও। তোমার শুভমিলনের খানা খেয়ে যাব আজ।'

মহিম। তা বোসো।—কি খাবে বল?

আজীন্দ্র। Anything! Anything! Anything! সন্দেশ খাব।

মহিম। আচ্ছা, আন্‌তে দিই, বোসো।

আজীন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিল, 'সে হবে এখন। আত্মহত্যার কথা কি বল্‌লে?'

মহিম। তিনি আত্মহত্যাই কর্‌তে গিছ্‌লেন।

আজীন্দ্র। আত্মহত্যা?

মহিম। হাঁ। কাপড়ে আগুন লাগিয়েছিলেন।

আজীন্দ্র। বড় কষ্ট পেয়েছিল না?

মহিম। তা না হ'লে সখ ক'রে কেউ জ্যান্ত পুড়ে মর্‌তে চায়?

আজীন্দ্র। জেনে শুনে এত কষ্ট ত সে সহ্য করেছিল আমার জন্য !

মহিম। নারীর প্রেম !—দেখা কর্‌বে ?

আজীন্দ্র। দেখা কর্‌বো ?

মহিম অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, ম্লানমুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'না ভাই, সুবিধে হ'ল না।'

আজীন্দ্র উঠিয়া পড়িল, 'না। এই ঠিক হয়েচে তোমরা সুখী হও, ভাই। আমি বঞ্চিতের দলে।'

মহিম। ও কি ? উঠ্‌চো যে ! খাবে না ?

আজীন্দ্র মহিমের পিঠে হাত চাপড়াইয়া বলিল, 'আজ থাক্। আর একদিন হবে।—তীরের রসি কাটা হয়েছে ; পালের রসিতে টান পড়্‌লো, দাঁড়ি মাঝি প্রস্তুত। কিন্তু নৌকো নড়্‌তে চায় না,—ঐ লুটিয়ে পড়া মাটির ক্ষিতি তার কোঁচার খুঁট ধ'রে প'ড়ে আছে, ছাড়বে না। তখন কি কর্‌তে হয় জান ? তখন একটা লোক হাত দিয়ে নৌকোটাকে ঠেলে দেয়,—তার বাঁধন খসিয়ে দেয়। তোমার হাত থেকে আজ সেই ঠেলা পেয়েছি। আজ থেকে অসীমের উত্তরঙ্গ তরঙ্গবুকে আমার অনাসক্ত, অবাধ যাত্রা ! Hurrah ! for the freedom !

আজীন্দ্র ছুটিয়া চলিয়া গেল। আর মহিম মূঢ়ের মত সেইখানেই বসিয়া রহিল।

ত্রিংশ

'আজীন এসেছে, দেখা করবে ?'

মাধুরী পান সাজিতেছিল, সব ছাড়িয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিল।

মাধুরীর মুখ হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে। ডানদিকটা হাসিতেছে। বাঁ দিকটাও যেন আজ হাসিতেছে। এ হাসি মহিম কখনও দেখে নাই।

আর এ কণ্ঠস্বর ? মাধুরীর কণ্ঠে আজ একটা অদৃশ্য পাখী যেন বহুদূর হইতে ডাক দিয়াছে 'ফটি ই—ক জল'। এ পাখীটার স্বরও সে কখনও শুনে নাই।

মহিম নতমুখে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। পরক্ষণে মাধুরী বলিল, 'না, আমি যাব না।'

বলিয়াই পান সাজিতে বসিয়া গেল।

এবার—মহিমের মুখে একটু হাসি ফুটিল। হাসিটা মুছিয়া সে বাহিরে আসিয়াছিল।

মাধুরী বসিয়া আছে। পান সাজা হয় নাই। সে কাঁদিতেছে। চোখের জল কিছুতেই শুকাইতে চায় না। ফোঁটার পর ফোঁটা বহিয়াই চলিয়াছে।

এত কান্না কিসের ?—কে বলিবে কিসের এই কান্না ? একটা অশ্রু-বিন্দু দেখিয়া কে বলিতে পারে কোথায় ইহার উৎস ?

বাহির হইতে আমরা যখন এঞ্জিনের শব্দ শুনি, তখন ভিতরে তুলা বাছাই হইতেছে, ধোনাই হইতেছে, বিভিন্ন আকারের যন্ত্রের মধ্য দিয়া সূতা প্রস্তুত হইতেছে, কাপড় বোনা হইতেছে।

বাহির হইতে এই সবগুলা কাজে একমাত্র একঘেয়ে প্রকাশ এঞ্জিনের শব্দ।

আজীন্দ্রের কাছে ছুটিতে গিয়াই তাহার মনে পড়িয়াছিল মুখের ক্ষতচিহ্নটার কথা। তাই সে আর যাইতে চাহে নাই। এই মুখ লইয়া তাহার সম্মুখে সে দাঁড়াইবে কিরূপে?

হায়, হায়! কোন্ নিষ্ঠুর দেবতা তাহার এমন রূপের উপরে এতবড় আঘাতটা করিল! এতবড় ঐশ্বর্য্য এমনি করিয়া নষ্ট করিয়া দিল! তাহার প্রাণে বাজিল না?—আজ মাধুরীর মত নিঃস্ব কে?

—আজীন্দ্রের এত প্রেম, সেও কি রূপের উপর নির্ভর করিতেছিল? রূপ ছাড়া সে আর কিছু দেখিতে চাহিবে না! কেন চাহিবে? ইহাই ত নারীজীবনের চরম অভিশাপ যে পুরুষ তাহার কাছে রূপ চাহিবে, আর কিছু চাহিবে না। রূপের পশ্চাতে একবার তাকাইলে কি এমনি করিয়া পদাঘাতে দূর করিয়া দিতে পারিত? হায়! অভাগিনী! রূপই যে তোর একমাত্র সম্বল!

—আজ আবার তিনি দেখা করিতে আসিয়াছেন, কোন্ স্পর্দ্ধায়? সে কি মানুষ নয়? সেও কি রক্ত মাংস দিয়া গঠিত হয় নাই? তাহার হৃদয়বৃত্তির উপর এতই শ্রদ্ধা তাঁর?

—আজ বুঝি কর্ম্ম ফুরাইয়াছে। তাই খেলানার সন্ধানে আসিয়াছেন? ধিক্! ধিক্! ধিক্!

—আর সে লজ্জাহীনা, সব জানিয়াও আত্মহারা হইয়া ছুটিতে চাহিয়াছিল। ছিঃ! ছিঃ! ইহার পূর্ব্বে সে মরিল না কেন?

—আহা! মহিম কি মনে করিল? হায়! অদৃষ্ট! প্রাণ দিয়া

পূজা করিল সে, আর আমি বর দিতে ছুটিয়াছিলাম আর এক জনকে ?

—আত্মীন্দ্রের কাছে তাহাকে হাজির করিতে মহিম সাহস করিল ত ! তাহার উপরে এত বিশ্বাস ! বিশ্বাসঘাতিনী সে,—এখনও এত বিশ্বাস ! হায় ! এত ঋণ সে শোধ করিবে কি দিয়া ?

—তাহার স্বামীও ত কম বিশ্বাস করিতেন না। শেষটা,—অবিশ্বাস করিয়াছিলেন কি ? নিজে ত কখনো কিছু বলেন নাই। যে রকম কথা কহিতেন সেই রকম কথা কহাই ত তাঁহার চিরকালের অভ্যাস ছিল।

—মাধুরী ভুল করে নাই ত ? হয়ত তিনি তাহার অপরাধ লন নাই,—সে নিজের মন হইতে গড়িয়া সব কাণ্ডটা করিয়াছে ! সেই দিন মহিমের বাড়ী হইতে ফিরিবার পথে স্বামীর যে রূপ দেখিয়াছিল, সেই কি দণ্ডদাতার রূপ ?

—ওগো, তিন জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কর্ত্তা, তোমার অপার করুণার পক্ষপুটে আজ মাধুরীকে রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর !—তাহার সন্দেহ যেন সত্য না হয় !

—স্বামী আজ কোথায় আছেন ? কি করিতেছেন ? বার্ণিশ পাম্প্‌স্, আর চুনোট করা পাঞ্জাবী লইয়া খিটিমিটি আজও আছে কি ? আজ কে তাঁহার শয্যারচনা করিয়া দিতেছে, কে জানে ?—বিবাহ করিয়াছেন কি ?—হয়ত করেন নাই, হয়ত মাধুরীর জন্ত আজও অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আসেন। কিন্তু হায় ! তাহার ত ফিরিবার উপায় নাই। পরের ছেলে আজ যে তাহার কোল জুড়িয়া !

—একবার তাহার একটি সন্তান হইয়া মারা যায়। সেও বহুদিন

রুগ্ন হইয়া থাকে। সেই অবধি ব্রজদুলাল তাহার গর্ভে সন্তান হইতে দেন নাই। হায়! তিনি যদি জানিতেন যে মাধুরীর সন্তানবহনের শক্তি আছে। আজ এমনি একটি সোনার চাঁদকে যদি সে স্বামীর কোলে দিতে পারিত!

—অপরাধ নিয়ো না ঠাকুর। মাধুরী গর্ব্ব করে নাই। সে খুব ভাল করিয়াই জানে যে শিশুকে রক্ষা করিবার শক্তিও তাহার নাই। সে শক্তি আছে শুধু তোমার, শুধু তোমার। তুমি দয়া কর। মায়ের কোল হইতে বাছাকে ছিনাইয়া লইও না।

—বিধাতার আশীর্ব্বাদে শিশুটি যদি বাঁচিয়াই থাকে, ত সেই বাঁচাই ত হইবে মৃত্যুর বাড়া। পিতার নাম করিতে পারিবে না, মাতার নাম শুনিলে মাটিতে মিশাইয়া যাইবে,—এই কি জীবন? ছি, ছি! মা হইয়া গর্ভের সন্তানকে সে এত বড় শাস্তিটা দিল! এই শাস্তির ভারে নতমস্তকে সে নির্জ্জন কারাবাস ভোগ করিয়া চলিবে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত।

আজ মাধুরীর চোখের জলের বিরাম নাই। আজীন্দ্রকে বিদায় দিয়া মহিম যখন ফিরিয়া আসিল তখনও সে বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। মহিম গিয়া পার্শ্বে বসিল।

মাধুরীর মনের উপরে যে কথাটা ভাসিতেছিল, সেইটাই সে বাহির করিয়া দিল, 'ছেলেটাকে তুমি আর কোথাও রেখে দাও। আমার গর্ভে জন্মেছে জান্‌লে ও যে লজ্জাতেই সারা হয়ে যাবে।'

মহিম। আমিও এই-কথা ক'দিন ধ'রে ভাব্‌চি মাধুরী। একটা উপায় আছে,—আমরা বিবাহ কর্‌তে পারি।

মাধুরী। বিবাহ?

মহিম। হাঁ। Civil marriage.

বর্ত্তমানের মানুষ মহিম সন্তানবতীকে বিবাহ করিতে চাহিল ১৯২৭ সালে—২১৫৮ সালের আইন মানিয়া।

কিন্তু চাহিলে কি হইবে? সে পথেও অন্তরায় হইল ব্রজদুলালের মৌন সত্তা।

ব্রজদুলাল নিজে কখনও কিছু বলেন নাই, কিন্তু আজ মরণদারুণ দণ্ডটা আসিল, তাঁহারই দিক হইতে।

উভয়েই এটা অনুভব করিল। কিন্তু কেহ কিছু বলিল না। পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ছোট দুটি মানুষের ছোট-খাট সুখ দুঃখের ইতিহাস।—কত তুচ্ছ তাহা! কিন্তু কি প্রকাণ্ড তাদের এই নীরবতা! অসীম আকাশ জুড়িয়া ইহার দোসর। তারায় তারায় অন্তর্গূঢ় ঘনব্যথায় এমনই মুখামুখি চাহিয়া আছে।—মধ্যে অনন্ত নীরবতা!

একত্রিংশ

'আজ কি শরীরটা ভাল বোধ হচ্ছে না?"

আজীন্দ্র বিছানার সহিত মিশিয়া রহিল। কোন জবাব দিল না। তৃপ্তি তাহার পাশে বসিল, তাহার গায়ে মাথায় হাত দিল। মনে হইল জ্বর হইয়াছে। জ্বর ত প্রত্যহই হইয়া থাকে।

আজীন্দ্র তাহার জলজলে বড় বড় চোখ দুইটা তৃপ্তির দিকে ফিরাইল, এবং অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, 'বৌদি,—Spent up!'

তৃপ্তি তাহার মাথা ও কপালে হাত বুলাইতে লাগিল।

আজীন্দ্র। একদিন উড়ন-তুবড়ির মত উঠেছিলুম—সমস্ত বাঁধন

ছিঁড়ে, বাতাস ফুঁড়ে, নীলাকাশের বুকের ওপর আলোকের রেখা টেনে। হঠাৎ আগুনটা নিঃশেষ হ'তেই দেখ্‌লুম অনন্ত শূন্যে কোথাও আমার স্থান নেই। তাই অন্ধকারভীত শিশুর মত ছুটে পালিয়ে এলুম, আবার সেই পুরাতন পৃথিবীতে। এসে দেখ্‌লুম সে আর আমাকে চায় না। যেখানে ছিল তার স্নেহশীতল কোমলতা সেখানটা আজ পাষাণের মত কঠিন; যেখানে আশ্রয় নিতে এলুম, সেখানে প'ড়ে আজ—চূরমার হয়ে গিছি।

তৃপ্তি তখনও হাত বুলাইতেছে। বুঝিতে পারিতেছে, বড় তাড়াতাড়ি হাত বুলাইতেছে। কিন্তু থামিতে পারিতেছে না।

আজীন্দ্র। প্রবাসে দেশের কথা ছাপিয়ে যার মুখ সর্ব্বদা মনে পড়্‌তো আজ তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিছ্‌লুম, বৌদি!

তৃপ্তি। বুঝিছি—তুই থাম্।

আজীন্দ্র। বুঝেছ?

তৃপ্তি। হাঁ, হাঁ, বুঝিছি। তুই একটু চুপ কর্ দিকি।

আজীন্দ্র। কি ক'রে বুঝলে, বৌদি? এত সহজে কি ক'রে বুঝলে, এই কি নিয়ম?

তৃপ্তি। আমি জানি না,—যাঃ।

আজীন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। তারপর, নিজের কথাটা চাপা দিবার জন্যই বলিল,'বৌদি তুমি অমন plan কর্‌লে। আমি ভাবলুম তোমার নামেই কাজ হবে। সবটা দাদার হাতে দিয়ে দিলে কেন?

তৃপ্তি। তাঁর হাতে দেবার জন্যই plan করিছিলুম। কি করি বল্? কিছুতে কাজে ভেড়াতে পারি না। তোর টাকাও নিতে চান না। তাই plan কর্‌লুম, ভুল কর্‌লুম;—তিনি সংশোধন করতে গিয়ে কেড়ে নিলেন,—মগ্ন হলেন,—আমি বাঁচলুম।

আজীন্দ্র। বৌদি, বড় ঠকিয়েছ।—আমার কেমন সন্দেহ ছিল তুমি দাদাকে তেমন ভালবাস না।

তৃপ্তি। ভালবাসি, তাই বা তুই জান্‌লি কি ক'রে?

আজীন্দ্র। মাটির নীচে আলু থাকে,—দেখ্‌লে মনে হয় না, গাছের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আছে। কিন্তু আজ যে দেখ্‌চি সে আপনাকে নিঃশেষিত কর্‌চে, ওরি ডালে ফুল ফোটাবার জন্য।—আচ্ছা, এ কি অত্যাচার, বৌদি? যে কিছুই চায় না, তার জন্য স্নেহের পারাবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌চে; আর যার প্রাণটা খাবি খাচ্চে এক কণা ভালবাসার জন্য, সে এ সংসার থেকে কিছুতেই পেল না।

তৃপ্তি। তুই একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর্।

আজীন্দ্র। হাঁ ঘুমুই।

আজীন্দ্র চোখ বুজিয়া কি যেন হাৎড়াইতে হৎড়াইতে তৃপ্তির একখানি হাত ধরিল। তারপর সেটিকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, 'একবার বিশ্বজোড়া দুর্ভিক্ষের দিনে বিশ্বামিত্র সমস্ত সংসার ঘুরে একটি পদ্ম পেয়েছিলেন। তোমার হাতখানি আমার কাছে আজ সেই পদ্মের মত,—আমার ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, আমার চরম সম্বল, চরম সম্বল, চরম সম্বল!' তারপর চোখ চাহিয়া তৃপ্তির দিকে ফিরিয়া বলিল, 'দেখ, শুক্‌নো গাছগুলো ফলে ভ'রে যায়। আর যার শিরায় শিরায় রসের বন্যা বইছে সেই আখের গাছের ফল হয় না। তাই তোমার কোন সন্তান নেই। নিজের নিরুদ্ধ মাতৃত্বকে উজাড় ক'রে ঢেলেছ দাদার জন্য। সংসারে এত প্রেমও ত আছে বৌদি। আমিই শুধু পেলুম না!

আজীন্দ্র মুদ্রিত নেত্রে ভাবিতে লাগিল একখানি মাতৃমূর্ত্তি,—অনন্তস্নেহশীলা, হাস্যময়ী, চিরজাগ্রতা, ধৈর্য্যের প্রতিমা, আপনাকে সে

নিঃশেষ করে!—সন্তানের জন্য অপরকে নিঃশেষ করিতেও তাহার বাধে না। সমস্ত বিশ্বের হৃদপিণ্ড উপড়াইয়া সে সন্তানকে খাওয়াইতে চায়। হিংস্র, খরদ্রংষ্ট্রা জলচ্চক্ষুঃ।—Tigress!

এবার তৃপ্তির দিকে ফিরিয়া সে গর্জ্জন করিল, 'Tigress of a Mother! আমার সমস্ত টাকা নিয়ে স্বামীকে দিয়েছ, খেলা কর্‌বার জন্য!'

অন্তর্যামী জানেন, আজীন্দ্র অভিনয় করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সুর ঠিক রাখিতে পারিল না। অশক্তিবশতঃ অভিনয় একেবারে নিখুঁত হইয়া গেল!

তৃপ্তি বেত্রাহতের মত লাফাইয়া উঠিল। অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, 'তা তুই যদি ইচ্ছা না করিস্, ত এখুনি তোর টাকা ফেরত দোবো।'

এ কথার যাহা উত্তর হওয়া উচিত, আজীন্দ্র তাহাই দিল, 'হা ফিরিয়ে দাও!'

বলিতে বলিতে সে শয্যায় উঠিয়া বসিল।

তৃপ্তি সভয়ে কক্ষ ত্যাগ করিল।

আজীন্দ্র তখনও চীৎকার করিতেছে, 'ফিরিয়ে দাও! ফিরিয়ে দাও! এখুনি ফিরিয়ে দাও! আমার সর্ব্বস্ব এমনি ক'রে খোয়াতে পার্‌বো না।'

হায় রে মানুষের দেহযন্ত্র! এর আনন্দের প্রকাশ চোখের জল, লোভের প্রকাশ সংযম, স্নেহের প্রকাশ নিষ্ঠুরতা!

আজীন্দ্র আজ কেমন করিয়া বুঝাইবে সে অর্থ চাহে নাই, অর্থ তাহার সর্ব্বস্ব নয়, অর্থে তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না! কেমন করিয়া বুঝাইবে যে সে শুধু কতগুলা অর্থহীন শব্দের ধাক্কায় নাচিতেছিল তাড়িতাহতপ্রতিহত pith ball puppet-এর মত?

বত্রিশ

রাজেন্দ্র বিনয়কে লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন। টেবিলের উপর কাগজপত্র ছড়ান। পল্লীসংস্কার-কার্য্যের Budget প্রস্তুত হইতেছে!

দাসী আসিয়া বলিল, 'মা অজ্ঞান হয়ে গেছেন,—কেমন করচেন আপনি একবার আসুন।

রাজেন্দ্র। ওখানে নেই কেউ? কাউকে ডেকে নিয়ে যা।

বিনয়। না, তুমিই যাও। কি হয়েছে, জানা নেই ত।

রাজেন্দ্র। কি আবার হবে? ও সব মেয়েলি হিষ্টিরিয়া।

বিনয়। তাঁর হিষ্টিরিয়া ছিল কি?

রাজেন্দ্র। ছিল না। হতে কতক্ষণ? নাও, নাও! তুমি কাজ কর।

বিনয় হাতের কাগজ মুড়িয়া ফেলিলেন, 'তোমার যাওয়া উচিত কিন্তু।'

রাজেন্দ্র। আঃ! তুমি একটুতে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়!

বলিয়া তিনি বিনয়ের হাত হইতে কাগজখানা কাড়িয়া লইলেন।

ঠিক এই সময়ের যোগেশ একখানা খবরের কাগজ আস্ফালন করিতে করিতে মহোল্লাসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই চীৎকার করিল, 'ওহে—Bank stops payment!'

রাজেন্দ্রও গর্জ্জন করিলেন, 'কোথায় পেলে? কোথায় পেলে? কৈ? কাগজ—'

বলিয়া তিনি হাত বাড়াইলেন। তারপর কম্পিত হস্তে কাগজখানা লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

যোগেশ। বাবা! হবে না? স্বদেশী concern!

রাজেন্দ্র পড়িতে পড়িতেই ধীর স্বরে বলিলেন, 'হাঁ, যেমন Allinace Bank.

পড়া শেষ করিয়া তিনি কাগজখানা এক পাশে সরাইয়া দিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন, 'বিনয়, খাতাপত্র গুটিয়ে ফেল।'

বিনয়। কেন, ঐ bank এ—

রাজেন্দ্র। ঐ bank-এই সব।

বিনয়। তা হ'লে—

রাজেন্দ্র। তা হ'লে এসো ভাই।

বলিয়া নমস্কার করিয়া উভয়কে বিদায় দিলেন।

বিনয় যাইবার সময় বলিল, 'একবার বাড়ীর ভেতর যাবে না?'

রাজেন্দ্র। এই যাই।

রাজেন্দ্র সন্তর্পণে টিন হইতে একটি সিগারেট তুলিয়া লইলেন। একবার এদিক ওদিক চাহিয়া ডাকিলেন, 'রাখাল!'

ভৃত্য আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। তিনি তখন মাথা নীচু করিয়া টেবিলের উপর সিগারেটটা ঠুকিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া রাখালকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'কি চাই তোর?

রাখাল। এই, বাতিটা ঠিক ক'রে দিতে এলুম।

বাতির Shade ঠিক করিতে করিতে সে একবার চারিদিকে চাহিয়া লইল। তারপর বলিল, 'দেশলাই দেবো?

রাজেন্দ্র যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। 'হাঁ, হাঁ, দেশলাইটা।'

দেশলাই টেবিলের উপরেই ছিল। রাখাল সেটা তুলিয়া লইয়া একটা কাটি জ্বালাইল। রাজেন্দ্র সিগারেট ধরাইয়া লইলেন।

রাখাল। চা তৈরী ক'রে আন্‌বো?

রাজেন্দ্র। আন্‌ দিকি।

রাজেন্দ্র হয়ত চায়ের জন্যই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কে যেন ঢুকিল? রাজেন্দ্র মুখ তুলিয়া দেখিলেন,—তৃপ্তি। একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছেন; কিন্তু তৃপ্তিই প্রথম কথা কহিল, 'আজীনের যে টাকাটা নিয়েছি, সেটা এখুনি ফেরত দিতে হবে।'—

বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল। একটা কি যেন মনে পড়িল।

'আচ্ছা থাক্! আমি কাল সব বল্‌বো। আজীনের শরীরটা বোধ হয় ভাল নেই।'

বলিয়া সে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

রাজেন্দ্র একটু হাসিলেন। 'That's it! টাকাটা এখুনি ফেরত দেওয়া চাই!'

একটা মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ! কে যেন 'আজীন' বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। ডাকিয়াই নিস্তব্ধ হইয়া গেল। কোথা হইতে শব্দটা আসিল ঠিক করা গেল না।

রাজেন্দ্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। এবং অন্ধ আকর্ষণের বশে আজীন্দ্রের কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দেখিলেন সে শুইয়া আছে। আর তৃপ্তি তাহার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। উভয়েই নিশ্চল।

আজীন্দ্রের মুখ দেখিয়া তাঁহার ভয় হইল। 'ওকে নিশ্বাস নিতে দাও! নিশ্বাস নিতে দাও।' বলিতে বলিতে তিনি শয্যাপার্শ্বে ছুটিয়া গেলেন, একবার তৃপ্তিকে উঠাইবার জন্য নত হইলেন,—পরক্ষণেই মনে হইল কিছু প্রয়োজন নাই, আজীন্দ্রকে মুক্ত করিবার

প্রয়োজন নাই, তৃপ্তিকে উঠাইবার প্রয়োজন নাই, কিছুরই আর প্রয়োজন নাই!

রাজেন্দ্র ধীরে ধীরে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার অপলক-দৃষ্টির সমক্ষে ভারতবর্ষ তাহার অগণিত অসংস্কৃত পল্লী ও অশিক্ষিত নরনারী লইয়া একখানা ঘুঁড়ির মত দেখিতে দেখিতে একটি বিন্দুতে বিলীন হইয়া গেল।

সমাপ্ত

প্রবাসী প্রেস, ৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ও রঞ্জন প্রকাশালয়ের পক্ষ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। রঞ্জন প্রকাশালয়ে ও ডি, এম, লাইব্রেরী, ৬১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।